ক্রুসেড-২১
ধাপ্পাবাজ
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশন

ক্রুসেড - ২১

ধাপ্পাবাজ

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ক্রুসেড - ২১

ধাপ্পাবাজ

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর 'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮, মোবাইল: ০১৭১৭৪৩১৩৬০

পঞ্চম মুদ্রণ : জানুয়ারী ২০১২

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৪

প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার

মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ ৫০.০০

CRUSADE-21
Dhappabaz
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by : Asad bin Hafiz
Published by : Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, Mobil · 01717431360
5th Editition: January 2012
Published on: April 2004

PRICE : 50.00 TAKA

ISBN 984-581-222-8

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী। ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর শহর-গ্রামে।

একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর সে স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

✖ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ✖ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ✖ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ✖ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ✖ ভয়াল রজনী ✖ আবারো সংঘাত ✖ দুর্গ পতন ✖ ফেরাউনের গুপ্তধন ✖ উপকূলে সংঘর্ষ ✖ সর্প কেল্লার খুনী ✖ চারদিকে চক্রান্ত ✖ গোপন বিদ্রোহী ✖ পাপের ফল ✖ তুমুল লড়াই ✖ উমরু দরবেশ ✖ টার্গেট ফিলিস্তিন ✖ গাদ্দার ✖ বিষাক্ত ছোবল ✖ খুনী চক্রের আস্তানায় ✖ পাল্টা ধাওয়া ✖ ধাপ্পাবাজ

এ সিরিজের পরবর্তী বই ক্রুসেড-২২

হেমসের যোদ্ধা

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?
চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু

চীনের মুক্তিপাগল মানুষের মরণপণ সংগ্রামের
কাহিনী নিয়ে লিখেছেন এক নতুন রহস্য সিরিজ–
'অপারেশন'।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের সাতটি বই

আতংকিত নানকিং ✖ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত ✖
ব্ল্যাক আর্মির কবলে ✖ হাইনান দ্বীপে অভিযান ✖
অশান্ত চীন সাগর ✖ বিধ্বস্ত শহর ✖ ড্রাগনহিলের
বিভীষিকা

অচিরেই বেরুচ্ছে অপারেশন সিরিজের পরবর্তী বই

মৃত্যু দ্বীপ

রমলা থেকে কায়রো, অনেক দূরের পথ। যাত্রাপথও অনেক কঠিন ও কষ্টকর। পাথুরে পার্বত্য এলাকা, ধূসর বালির বিবর্ণ প্রান্তর, মাটির অসংখ্য উঁচু-নিচু টিবি এসব পার হয়ে যেতে হয় কায়রো। পার হতে হয় সুদীর্ঘ বিশাল ও উন্মুক্ত মরুভূমি।

এই পথে অনেক বিপদ ও ভয় হঠাৎ করেই নেমে আসে যাত্রীদের জীবনে। কখনো ভয়ংকর মরু ডাকাত তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। কখনো অচেনা যাত্রী এসে রক্ত ও জীবন চুষে নেয়।

সুলতান আইয়ুবীর পরাজিত সৈন্যরা এই কঠিন পথ ধরেই যুদ্ধের ময়দান থেকে মিশরে যাত্রা করল। তারা সেই দীর্ঘ ও ভয়ংকর রাস্তা পাড়ি দিচ্ছিল, যেখানে যে কোন সময় অজানা বিপদ এসে বিপন্ন করতে পারে তাদের জীবন।

পুরো বাহিনী একসাথ হয়ে আসবে, তেমন সময় ও সুযোগ তাদের ছিল না। তাই ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে পথ চলছিল ওরা।

তাদের ফিরে আসার দৃশ্য ছিল খুবই করুণ ও ভয়ংকর। ওদের অনেকেরই মরুভূমিতে পথ চলার অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতা ছিল না। মরুভূমির বালিতে একবার পা ডেবে গেলে সে পা আর তুলতে পারতো না এসব আনাড়ি পথিক। যুদ্ধ নয়, এই দুর্গম পথ পাড়ি দিতে গিয়েই অনেকে লাশ হয়ে

পড়ে রইল মরুভূমিতে। কেউ হল মরুভূমির শিয়াল ও নেকড়ে বাঘের শিকার। তাদের দেহের হাড্ডি টেনে ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল হায়েনার দল।

যারা কাফেলা বেঁধে পথ চলার সুযোগ করে নিতে পারল, তারা এসব পরিণাম থেকে কিছুটা রেহাই পেল। আর যারা উট, ঘোড়া বা খচ্চরের উপর চড়ে রওনা করার সুযোগ পেল, তারা এই কষ্ট ও যাতনা থেকে কিছুটা রেহাই পেল। উত্তপ্ত বালির ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেয়ার শ্রম তাতে কিছুটা লাঘব হলো ওদের।

এমনি এক ছোট্ট কাফেলা রমলা থেকে কায়রো ফিরছিল মরুভূমির পথ ধরে। কাফেলার সবাই ছিল আইয়ুবীর পরাজিত সৈন্য। তাদের কেউ ছিল ঘোড়ার পিঠে, কেউ উটের পিঠে। রাস্তায় তাদের আরও দু'একজন করে যাত্রী জুটতে লাগল। এক সময় এই ছোট্ট দলটি ত্রিশ-চল্লিশ জনের এক কাফেলায় পরিণত হয়ে গেল।

তারা এক ভয়ংকর মরু অঞ্চল পার হচ্ছিল। আজ এই কঠিন মরু অঞ্চলকে সিনাই মরুভূমি বলা হয়। তারা সবাই এক সাথে থাকার কারণে তখনো তাদের মনোবল ছিল অটুট। কিন্তু মরুভূমির এই সুদূর বিস্তৃত দিগন্তব্যাপী চরাচরে পানির কোন চিহ্নই দেখতে পাচ্ছিল না কেউ।

যুদ্ধের ময়দান থেকে জীবন নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে, এটাই ছিল তাদের বড় শান্তনা। কিন্তু এর চেয়ে বড়

বিপদ যে তাদের সামনে আসতে পারে এ কথা কেউ চিন্তাও করেনি।

পরাজিত ক্লান্ত সৈন্যরা পা টেনে টেনে কদম ফেলছিল আর কাফেলার সাথে তাল মিলিয়ে কোন মতে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদের কারো অবস্থাই এমন ছিল না যে, একে অন্যকে সাহায্য করে। তবে কেউ মরে গেলে তাকে বালির নিচে দাফন করার মত অবস্থা তখনো তাদের ছিল।

আরোহীরা চলতে চলতে এমন এক এলাকায় পৌছে গেল, যেখানে মাটির উঁচুনিচু টিলা এবং মস্ত বড় বড় স্তম্ভ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ একজন দূরে একটি টিলার আড়ালে এক লোকের মাথা ও কাঁধ দেখতে পেলো। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্য। চকিতেই তা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকটি তার সঙ্গীকে বললো, 'ওই টিলায় আমি একজনকে এই মাত্র দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমরা ওখানে গিয়ে থেমে যাবো। ওখানে পানি না পাওয়া যাক, একটু ছায়া তো পাওয়া যাবে!'

কাফেলার যাত্রীদের অধিকাংশই ছিল পিপাসায় কাতর। তাদের গলা শুকিয়ে খরখরে হয়ে গিয়েছিল। মুখ দিয়ে কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল। মুখে পানি না থাকলে জিভ নাড়ানো যে কষ্টের, এ কথা কেউ এতদিন ভেবেও দেখেনি। আজ বুঝলো তার মর্ম।

প্রথম দিকে কাফেলার একজন আরেকজনের সাথে হেসে কথা বলেছিল। যুদ্ধের কথা, বাড়ীর কথা অনেক কিছুই তারা আলাপ করেছে। কিন্তু যতই এগিয়ে গেছে, ততই তাদের

কথার বহর কমে এসেছে। কমতে কমতে এক সময় কথা বলা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, এখন আর কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না।

তাদের পশুগুলোর অবস্থাও একই রকম। যদিও কোন পশু বা যাত্রী এখনও পিপাসায় মারা যায়নি, কিন্তু যে কোন সময় প্রাণ-বায়ু উড়ে যেতে পারে, এ অবস্থা অনেকেরই। মাত্র এক মাইল দূরের টিলা যেন শত মাইল দূরে মনে হচ্ছে।

কাফেলা চলতে চলতে সেখানে পৌছে গেল। দু'টি টিলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কাফেলাটি দুই টিলার মাঝে গিয়ে টিলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়লো।

একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্য সকলেই সেখানে পশুগুলোর পিঠ থেকে নেমে এলো। পশুগুলোকে ছায়ায় ছেড়ে দিয়ে নিজেরাও বসে পড়লো টিলার ছায়াতে।

ছায়ায় বসেও স্বস্তি পাচ্ছিল না কেউ। আগুনের মত গরম বাতাস বইছে। সেই বাতাস আঘাত হানছে যাত্রীদের চোখে-মুখে। তপ্ত বাতাসের ছ্যাকা খাওয়ার পর সেই যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে।

তখনো ওরা সেখানেই বসে আছে, এমন সময় ওরা দেখতে পেল, টিলার অন্য পাশ থেকে এক লোক তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। লোকটি আড়াল থেকে তাদের সামনে পৌঁছেই মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেল।

লোকটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা। গায়ে ছিল সফেদ লম্বা জোব্বা। জোব্বাটি কাঁধ থেকে পা

পর্যন্ত ঝুলে আছে। লোকটির দাড়ি কালো এবং খাঁটো। সে দাড়ি পরিপাটি করে আঁচড়ানো।

লোকটির হাতে একটি লাঠি। এমন লাঠি সাধারণত: পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোকেরা ব্যবহার করে। মসজিদের খতিবও মিম্বরে দাঁড়ানোর সময় এমন ল্যাঠিতে ভর করে দাঁড়ান।

লোকটি নীরবে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটিকে দেখে কাফেলার লোকজন বেশ অবাক হলো এবং লোকটি কি করে বা বলে দেখার জন্য নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চেহারায় কোন কষ্ট বা মালিন্যের ছাপ ছিল না।

কাফেলার কেউ একজন আস্তে করে বললো, 'হযরত খিজির (আ:) হবেন হয়তো।'

'না ইনি এই পৃথিবীর মানুষ নন!' পাশের লোকটি প্রতিবাদ করে বলল।

এই বিরাণ মরুভূমিতে লোকটি এমনভাবে চলাফেরা করছিল, মনে হচ্ছিল, মরুভূমি নয়, লোকটি বিকেলের মিঠে রোদে বাগানে পায়চারী করছে। লোকটির এমন উদ্বেগহীন আচরণে কাফেলার লোকদের মনে কেমন এক ধরনের ভয় এসে জমা হতে লাগলো।

এমনিতেই দুর্গম পথের আতঙ্ক ও ভীতি লেগেছিল তাদের চোখে, সেখানে এসে ঠাঁই নিল নতুন এক অজানা ভয়ের শিহরণ। আর সে ভয় এমনই তীব্র ছিল যে, এই রহস্যময় লোকটির পরিচয় জিজ্ঞেস করার সাহসও হলো না কারো। লোকটি কে, এই বিজন ও নিষ্ঠুর প্রান্তরে তিনি কি করছেন, কেউ এ কথাটিও জিজ্ঞেস করলো না।

পোড়া মরুভূমির কঠিন উত্তাপ অগ্রাহ্য করে কি করে এমন উজ্জ্বল ও প্রশান্ত চেহারা নিয়ে তিনি তাদের সামনে হাজির হলেন, প্রত্যেকের মনেই এ প্রশ্ন তখন তোলপাড় করছে। লোকটির ধোপদুরস্ত পরিষ্কার পোষাক তাদের ভীতি আরো বাড়িয়ে দিল। লোকগুলো হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লোকটির দিকে।

এ লোক যদি কোন সৈনিক হতো, তবে এই কাফেলার কেউ হয়তো তাকে দেখে ভয় পেতো না। কিন্তু এ লোক সৈনিক নয়, কোন মরু ডাকাতও নয়, খুবই শরীফ ও ভদ্রগোছের কেউ। কোন শাহী দরবারের সম্মানিত ওমরা বা সুফী দরবেশ কেউ হবেন, যাকে দেখলেই মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্ম নেয়। তাহলে কে তিনি? এখানে তিনি কি করছেন? তিনি মানুষ, নাকি মানুষের বেশে কোন ভুত-প্রেত?

কাফেলার লোকগুলো তখনো অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে লোকটির দিকে, তখনি ঘটলো দ্বিতীয় বিস্ময়কর ঘটনাটি। টিলার অন্য পাশ থেকে এক যুবতী এসে দাঁড়ালো লোকটির পাশ ঘেঁষে। এই দেখে লোকগুলো যখন বাকহারা এবং স্তম্ভিত তখন তৃতীয় চমক হয়ে লোকটির পাশে এসে দাঁড়ালো আরো একটি মেয়ে। এতটুকু দেখেই লোকগুলো ভয় ও আতঙ্কে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল।

মেয়ে দুটিই আপাদমস্তক বোরকা পরিহিতা। তাদের মুখে নেকাব আছে, তবে তা হালকা জালের মত পাতলা কাপড়ের। সে জন্য তাদের ফর্সা চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল যাত্রীরা।

বোরখার কারণে মেয়েদের শরীরের আর কোন অংশ দেখা না গেলেও, যেটুকু দেখতে পাচ্ছিল তাতেই লোকজন স্বীকার করতে বাধ্য হলো, মেয়ে দু'টি অসামান্যা রূপসী।

লোকটি এমন একটা ভাব করলো, যেন সে এক শাহানশাহ, সম্রাট। তার হাঁটার ভঙ্গিতে গাম্ভীর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাচ্ছিল। কয়েক কদম এগিয়ে লোকটি কাফেলার লোকগুলোর একদম কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। দুই পর্দনাসীন মহিলাও তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে গেলো।

লোকটির সম্মানে কাফেলার এক লোক উঠে দাঁড়ালো। তার দেখাদেখি অন্যরাও উঠে দাঁড়িয়ে গেলো। তাদের এ সম্মানের সাথে জড়িয়ে ছিল ভয় ও আতঙ্ক।

লোকটি তাদের সামনে বসে পড়ল। মেয়েরাও বসলো তার পাশে। জালের মধ্য থেকেও মেয়ে দু'টির পটলচেরা মায়াবী চোখগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। ওরা পলকহীন চোখে তাকিয়েছিল কাফেলার লোকগুলোর দিকে।

সেই অতি মানবীয় লোকটি হাত ইশারায় সবাইকে বসতে বলল। লোকজন বসলে সে লোক কথা শুরু করল, 'আমিও সেখান থেকেই এসেছি, যেখান থেকে তোমরা এসেছো।' কালো দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, 'পার্থক্য শুধু এই, তোমরা ফিরে যাচ্ছো নিজের বাড়ীতে আর আমি আমার বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছি।' লোকটির কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ল বিষণ্ন উদাসীনতা।

'আমরা কেমন করে বিশ্বাস করবো, আপনি আমাদের মতই এক সাধারণ মানুষ?' এক সৈনিক বললো, 'আমরা তো আপনাকে অভিজাত ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেউ মনে করছি।'

'না, এখন আমি তোমাদের মতই এক সাধারণ মানুষ! আর এ মেয়ে দু'টি আমার কন্যা।' দরবেশ [illegible] উত্তরে বলল, 'আমিও তোমাদের মত রমলা থেকে পালিয়ে এসেছি। যদি আমার মুরশিদ আমার উপর দয়া না করতেন তবে খৃস্টানরা আমাকে খুন করে ফেলতো আর আমার এই দুই কন্যাকে ধরে নিয়ে যেতো। এটা আমার মুরশিদেরই কৃতিত্ব যে, তিনি আমাদের হেফাজত ও নিরাপত্তা দিয়ে ধন্য করেছেন। আমি রমলার বাসিন্দা। শিশুকাল থেকেই ধর্ম শিক্ষার প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। ওস্তাদের কাছ থেকে আমি অনেক এলেম হাসিলও করেছি।'

কথা বলছে লোকটি, তন্ময় হয়ে শুনছে কাফেলার যাত্রীরা। লোকটি বলে চলেছে, 'শিক্ষা জীবন শেষ করার পর ওস্তাদের পরামর্শে আমি মসজিদে ইমামতি শুরু করি। আল্লাহই তার রাসূল ও দ্বীনের অনুসারীদের প্রতিপালন করেন। এক রাতে আমি স্বপ্নে হুকুম পেলাম, 'বাগদাদ চলে যাও, আর সেখানে বাগদাদের শাহী মসজিদের ইমাম সাহেবের শাগরেদ হয়ে বসবাস করতে থাকো।'

আমি পায়ে হেঁটেই বাগদাদ রওনা দিলাম। আমার কাছে টাকা পয়সা তেমন কিছু ছিল না। আমার মা বাবা ছিল খুবই দরিদ্র। ছোট একটা মশকও আমার ভাগ্যে জোটেনি যে, রাস্তায় পানি পান করবো। বিদ্যার নেশা আমাকে ঘর থেকে

বের করে দিল। সবাই বললো, এ ছেলে রাস্তাতেই মারা যাবে। আমার মা অনেক কাঁদলেন, বাবাও কাঁদলেন। কিন্তু আমি বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলাম।

দিনের বেলা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আমার জান বের হয়ে যেত। সন্ধ্যার পরে আমি এই আশা নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তাম, যেন এভাবেই আমার মৃত্যু হয়। কিন্তু ঘুম থেকে জেগে দেখতাম, আমার পাশে এক পিয়ালা পানি ও কিছু খাবার রাখা।

প্রথম প্রথম আমি ভয় পেতাম ও এগুলো কোন জ্বীন-পরীর কাজ মনে করতাম। কিন্তু রাতে স্বপ্নে আমাকে জানানো হলো, এসব কোন এক মুরশিদের কেরামতি। কিন্তু আমি জানতাম না, সে মুরশিদ কে ও কোথায় থাকে। আমি খেয়ে পিয়ে আবার গভীর নিদ্রায় শুয়ে পড়তাম। সকালে উঠে দেখতাম, সেখানে পিয়ালা পানি কিছুই নেই, রুটিও না।

বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছতে দুইবার নতুন চাঁদের উদয় হলো। সে এক দীর্ঘ এবং কষ্টকর যাত্রা। প্রতি রাতেই আমি পানির পিয়ালা ও খাবার প্যাকেট পেতাম। বাগদাদ শাহী জামে মসজিদের ইমাম আমাকে দেখে আমার পরিচয় না নিয়েই বলতে লাগলেন, 'আমি কত দিন ধরে তোমার অপেক্ষায় আছি।'

তিনি আমাকে তার হুজরার মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম! দেখলাম, প্রতি রাতে যে থলে ও পিয়ালায় করে আমাকে খাবার ও পানি দেয়া হতো

সেই থলে ও পিয়ালা সেখানে রাখা। খতিব সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার খাবার ঠিকমত পৌঁছতো তো?'

আমি উত্তরে বললাম, 'জি হ্যা।'

কিন্তু আমি এই ভেবে অবাক হলাম, প্রতি রাতে এই থলে ও পিয়ালা কে আমার কাছে বহন করে নিয়ে যেত? আর কেইবা সেগুলো এখানে ফিরিয়ে আনতো?

তিনি বললেন, 'আল্লাহ যখন হযরত মুসা (আ:)কে সাহায্য করতে চাইলেন, তখন তিনি নীল দরিয়াকে আদেশ করলেন, 'রাস্তা দিয়ে দাও।' নদীর উজানের পানি উজানে ও ভাটির পানি ভাটিতে দাঁড়িয়ে গেল আর মাঝখান দিয়ে মোটা রাস্তা অতিক্রম করে হযরত মুসা (আ:) তাঁর দলবলসহ নদী পার হয়ে গেলেন। কিন্তু ফেরাউন যখন তার অনুসরণ করে সেই রাস্তায় প্রবেশ করলো তখন দু'দিকের পানি আবার এক হয়ে গেল। নদী আবার পূর্বের মত প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে লাগলো। ফেরাউন নদীতে ডুবে মারা গেল।'

লোকটি বলতে লাগলো, 'সম্মানিত খতিব বললেন, আমি সেই মহান মালিকের অধীন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার তার কাছে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন। তার যে বান্দা তার প্রেমে মাতোয়ারা থাকে এবং তার জ্ঞান হাসিলের জন্য পাগলপারা হয়ে যায়, যেমন তুমি হয়েছ, তাকে তিনি মরতে দেন না। কঠিন মরুভূমিতে তার খাবার ও পিপাসার পানি তিনিই সরবরাহ করেন। উত্তাল জোয়ারের সময় নদীতে পড়ে গেলেও তিনিই তাকে রক্ষা করেন।

করুণার আধার আমার সেই মালিক আমাকে হুকুম করলেন, 'এক বান্দাকে আমি তোর কাছে আসতে বলেছি।' তিনি আমাকে তোমার ছবি দেখিয়ে বললেন, 'এই ছেলে এরই মধ্যে তোর কাছে রওনা হয়ে গেছে। হে খতিব, তোর ভেতরে যে জ্ঞান ও ইলম রয়েছে সেই জ্ঞান ঐ ছেলেটার অন্তরে দিয়ে দিবি। আর আমি তোর খেদমতের জন্য যে জ্বীনদের নিযুক্ত করে রেখেছি, তাদের বলবি, তারা যেন ছেলেটাকে নিয়মিত রোজ রাতে খাবার ও পানি পাঠাতে থাকে।'

আমি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করেছি মাত্র। প্রতি রাতে এখান থেকে তোমার জন্য খাবার ও পানি পাঠানো হতো। আর সে খাবার যথাসময়ে পৌছে যেতো তোমার কাছে। ওহে বালক, অবাক হয়ো না, অধীর হয়ো না। খুব কম লোকের ভাগ্যেই এ বিদ্যার আলো জোটে। এই নূরে আলোকিত হয় অন্তর। তুমি বড় ভাগ্যবান। যে আলো আমার মাঝে আছে সে আলো তুমি পাবে। তবে তোমাকে সৎ হতে হবে, আর মনে আল্লাহকে খুশী করার ইচ্ছা থাকতে হবে। তখন জ্বীন ও মানুষ তোমার তাবেদার হয়ে যাবে।'

'জ্বীনেরা কি আপনার গোলাম?' এক সিপাই প্রশ্ন করলো।

'না, তা নয়।' লোকটি উত্তর দিল, 'আমরা সবাই আল্লাহর গোলাম। জ্বীন ও ইনসান কেউ কাউকে গোলাম বানাতে পারে না। আমরা সবাই তাঁরই গোলামী করি, যাঁর

কাছে উঁচু-নিচু, ধনী-গরীবের পার্থক্য নেই। ঈমানের দৃঢ়তা ও দুর্বলতা দ্বারাই মানুষ বড়-ছোট হয়।'

লোকটির কথায় এমন প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি ছিল যে, সকলের মনই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল। তারা মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে লাগলো।

লোকটি বলতে লাগলো, 'বাগদাদের খতিব আমার আত্মাকে জ্ঞান দ্বারা আলোকিত করে দিলেন। তিনি আমার বিয়েও দিয়ে দিলেন। সেখানেই আমার এ দু'টি মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। আমি অনেক সাধনা করে আল্লাহর মহিমার কয়েকটি গোপন রহস্য পেয়েছি।

এক রাতে আমার উস্তাদ খতিব সাহেব আমাকে বললেন, 'এখন তুমি এখান থেকে চলে যাও। গিয়ে সেই সব আল্লাহর বান্দার খেদমত করো, যারা আল্লাহর বান্দা হয়ে তার খেদমত করতে চায়।'

তিনি আমাকে আমার দেশ রমলা যাওয়ার আদেশ দিলেন। দু'টি উট দান করলেন, যেন আমার সফর আরামদায়ক হয়। পথের খরচ দান করলেন আর বললেন, 'দেখো, জীবনে আর কোন পাপ ও অন্যায়ের চিন্তাও করবে না। রমলা যখন পৌঁছবে, তখন এক রাতে তুমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই উঠে একদিকে যাত্রা শুরু করবে। হয়তো তোমাকে বেশী দূর যেতে হবে না। কিন্তু যেখানে তোমার পা নিজে নিজেই থেমে যাবে সে স্থানটি এক পবিত্র স্থান। তুমি সে স্থানেই তোমার আস্তানা বানিয়ে নেবে।

কিন্তু খুব শীঘ্রই ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঢাকা এক সময় তোমার সামনে হাজির হবে। তখন তোমার পাপ ও অন্যের পাপের শাস্তিও তোমাকে ভোগ করতে হবে। অবস্থা তখন এতটাই নাজুক হয়ে যেতে পারে যে, তোমাকে সেখান থেকে হিজরত করতে হবে।'

আমি যখন আমার স্ত্রী ও এই দুই মেয়েকে নিয়ে পথে বের হলাম, তখন সূর্যের তেজ ও প্রখরতা আমার এ ছোট্ট পরিবারের জন্য ঠাণ্ডা ও শীতল হয়ে ধরা দিল। আমরা আল্লাহর মর্জি সে স্থানেও পানি পেলাম, যেখানে বালির কণা ছাড়া এক ফোটা পানিও ছিল না।

আমি রমলা পৌঁছে দেখলাম, ততদিনে আমার মাতাপিতা মারা গেছেন। আমার স্ত্রী সেই বিরান বাড়ীকে আবার আবাদ করে তুললো। আমি জ্ঞান সাধনার সাগরে ডুবে রইলাম। আমার মেয়ে দু'টি আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো।

একদিন আল্লাহতায়ালা তাদের মাকেও তাঁর কাছে ডেকে নিলেন। তখন মেয়েরাই আমার দেখাশোনা ও বাড়ীর কাজ করতে লাগলো। পরে এক রাতে আমি গভীর ঘুম থেকে কারো ডাকে জেগে উঠলাম। কিন্তু কে আমাকে ডেকে তুলল বুঝতে পারলাম না।

আমি উঠে একেবারে দাঁড়িয়ে গেলাম। বাগদাদ জামে মসজিদের খতিবের অনেক পুরানো কথা আমার মনে পড়ে গেল, 'তুমি সহসাই জেগে উঠবে ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাত্রা করবে।'

ঠিক তাই হলো। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে এলাম এবং একদিকে হাঁটা ধরলাম।

হাঁটতে হাঁটতে আমি আমার গ্রাম ও লোকালয় ছেড়ে এলাম। আমি থামতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আমার পা আমাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চললো। আমি চলতেই লাগলাম।

জানি না তোমরা সে স্থানটি দেখেছো কি না। সেখানে গভীর খাদ ছিল এবং খাদের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। খৃস্টানদের অসংখ্য সৈন্য সেই খাদের গভীরে লুকিয়েছিল। আমি শুনেছিলাম, সুলতান আইয়ুবী অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি মাটির দেয়াল ভেদ করে লুকানো শত্রু দেখতে পারেন। কয়েক মাইল দূর থেকে শত্রুর গন্ধ পেয়ে যান। শিকারী জন্তু যেমন গন্ধ শুঁকে শিকারের কাছে চলে যায়, তেমনি তিনি শত্রুর গন্ধ শুঁকে শত্রুর কাছে চলে যেতে পারেন।

হয়তো আল্লাহ সত্যি সত্যি আইয়ুবীকে এমন শক্তি দিয়েছিলেন। আর সেই শক্তির বলেই তিনি বার বার যুদ্ধে জিতে ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ অহংকারী মানুষ পছন্দ করেন না। বিজয়ের পর বিজয় তার মনে অহংকার জন্ম দিয়েছিল।

তাই এবার যখন তিনি অভিযানে বের হলেন, আল্লাহর রহমত তার কাছ থেকে বিদায় হয়ে গেল। আল্লাহ তাকে যে নেয়ামত দিয়েছিলেন, তা উঠিয়ে নিলেন। তাঁর চোখের উপর আল্লাহ এমন পট্টি বেঁধে দিলেন যে, শত্রু তো দূরের কথা, তিনি নিজে কোথায় আছেন তাও জানতে পারলেন না। তাই ক্রুসেড বাহিনী তোমাদেরকে তাদের ফাঁদে ফেলে দিল। তারপর তারা খাদের ভেতর থেকে স্রোতের মত বেরিয়ে

এলো এবং তোমাদের আক্রমণ করলো। তারপরের অবস্থা তো তোমরাই ভাল জানো।

এই যুদ্ধের কয়েক বছর আগের কথা। আমি কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে একদিন এই খাদের কাছাকাছি এক জায়গায় এসে পৌঁছলাম। সেখানে আমার পা হঠাৎ করেই থেমে গেল।

তখন ছিল চাঁদনী রাত। আমি সেখানে এক মাজার দেখতে পেলাম। কবরের চারপাশ পাথরের দু'হাত উঁচু দেয়াল দ্বারা বাঁধানো। আমি পরীক্ষা করার জন্য অন্য দিকে ফিরলাম। কিন্তু আমার পা আমাকে আবার কবরের দিকেই ঘুরিয়ে দিল।

এবার আমি কবরের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার যাওয়ার জন্য পাথরের রাস্তা বানানোই ছিল। সেই পথ ধরে আমি কবরের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত দোয়ার জন্য উঠে গেলো।

আমার মনে হতে লাগলো, চাঁদ যেন আরও বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমার মনে হলো, আমার ওস্তাদ মনে হয় আমাকে এই স্থানের কথাই বলেছিলেন। আমি কবরের পাশে বসে গেলাম ও কবরের উপর হাত রেখে আবেদন করলাম, 'আমার মত দাসের উপর আপনার কি আদেশ?'

আমি এ প্রশ্নের কোন উত্তর পেলাম না। আমার মন বলল, এখানে কিছু চাইতে নেই। যে কল্যাণ ও সুবিধা তোমার পাওয়া উচিত তা স্বাভাবিক ভাবেই তার তরফ থেকে হয়ে যাবে।

আমি রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দিলাম। সকালে নদীতে অজু ও গোছল করতে গেলাম। তারপর কবরের কাছে এসে নামাজ পড়লাম।

সেখান থেকে যখন বিদায় হলাম তখন মাতালের মত আমার নেশা নেশা ভাব হলো। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমার মনে হলো, এটাই সে জায়গা, যেখানে আমাকে আস্তানা গাড়তে বলেছিলেন আমার ওস্তাদ।

তারপর থেকে আমি নিয়মিত সেই মাজারে যাতায়াত শুরু করলাম। বলতে গেলে সেখানেই আমার আস্তানা বানিয়ে নিলাম। সেই কবরের পাশে দাঁড়ালে আপনাতেই আমার মনে নতুন নতুন ভাব জাগতো। তারপর সেটাই আমার বিশ্বাসে পরিণত হতো।

আমি কবরের উপরে উঁচু করে গুম্বুজ বানিয়ে নিলাম। লোকজন জোর করে আমার মুরীদ হতে লাগলো। ক্রমে আমি দূর দূরান্ত পর্যন্ত সফর শুরু করলাম। হাজার হাজার মানুষ আমার মুরীদ হয়ে গেল। আমি হলব এবং মুশেলের বিভিন্ন অঞ্চলে গেলাম। এমনকি বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করলাম।

কিছুদিন থেকে আমি দিনের বেলাতেই এমন সব ইশারা পেতে লাগলাম, যা খুব ভাল নয়। মনে হলো, যে মহামানব এই মাজারে শুয়ে আছেন তার আত্মা অশান্ত হয়ে উঠেছে।

কবরের উপর আমি সবুজ চাদর বিছিয়ে দিলাম। এক রাতে চাদরে ফড়ফড় শব্দ হতে লাগল। আমি ভয় পেয়ে

গেলাম। আমি চাদরের উপর হাত দিয়ে বললাম, 'মুরশিদ! আমার জন্য কি আদেশ?'

মাজারের মধ্যে থেকে শব্দ হলো, 'তুমি দেখছো না, মুসলমানরা এখন মদ পান করতে শুরু করেছে?' এর আগে আমি আর এমন শব্দ কোনদিন শুনিনি। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি মুসলমানদেরকে মদের অপকারিতা সম্পর্কে সাবধান করো।'

আমি তার আদেশ অনুযায়ী কাজ শুরু করলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম, গরীবরা কেউ মদ পান করে না। মদ পান করে বড় বড় অফিসার ও আমীররা। তাদের কান পর্যন্ত আমার সাবধান বাণী পৌঁছতো না।

আবারও এক রাতে কবরের চাদর ফড়ফড় করে আমাকে জানিয়ে দিল, মিশর থেকে আসা সৈন্যরা মুসলিম এলাকায় মুসলমানদের সাথে ঠিক সেই ব্যবহার করছে, যেমন ব্যবহার ক্রুসেড বাহিনী করে থাকে। সে সময় সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্য দামেশকেও ছিল।

দামেশক থেকে হলব পর্যন্ত এবং হলব থেকে রমলা পর্যন্ত সৈন্যদল স্থানে স্থানে ছড়ানো ছিটানো ছিল। এই সব সৈন্যদের কমাণ্ডাররা মুসলমান বাড়ীতে ঢুকে মূল্যবান জিনিস ও নগদ অর্থ জোর করে কেড়ে নিতো। তারা পর্দানশীন মেয়েদের উপরেও হাত বাড়াল।

তাদের দেখাদেখি সাধারণ সৈনিকরাও লুটপাট শুরু করে দিল এবং নারীদের লাঞ্ছিত করতে লাগল। এমন সংবাদও

পাওয়া গেছে, সেনাপতি ও কমাণ্ডাররা মুসলমান মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে তাদের ক্যাম্পে তুলেছে।

মাজার থেকে আমাকে আদেশ দেয়া হলো, তুমি সুলতান আইয়ুবীর কাছে যাও। তাঁকে বলো, এই সৈন্য তো খেলাফতে বাগদাদের বাহিনী, মিশরের ফেরাউনের বাহিনী নয়। তারা যদি এমন পাপ কর্ম চালু রাখে, তবে তাদের হাশর ফেরাউনের মতই হবে।

সে সময় সুলতান আইয়ুবী হলবের নিকটে ক্যাম্প করেছিলেন। আমি এত দূর রাস্তা অতিক্রম করে তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলাম, তখন তাঁর রক্ষীরা বললো, 'তুমি সুলতানের সাথে কেন দেখা করতে চাও?'

আমি বললাম, 'আমি রমলা থেকে এসেছি ও একটি সংবাদ এনেছি।'

তারা জিজ্ঞেস করলো, 'সংবাদ কে দিয়েছে?'

আমি বললাম, 'সংবাদ যিনি দিয়েছেন, তিনি জীবিত নন।'

রক্ষীরা হো হো করে হেসে উঠলো। তাদের কমাণ্ডার উচ্চস্বরে বললো, 'ওগো, তোমরা যদি পাগল দেখতে চাও তো আসো। এই লোক বলছে, সে কবর থেকে সুলতানের জন্য সংবাদ এনেছে।'

অন্য একজন বললো, 'এ লোক নিশ্চয়ই শেখ মান্নানের চেলা। বেটা ফেদাইন দলের লোক, সুলতানকে হত্যা করতে এসেছে। একে ধরো, বন্দী করো।'

অন্য একজন বললো, ‘এ লোক খৃস্টানদের চর! একে হত্যা করো।’

আমি বন্দী হওয়ার ভয়ে বললাম, ‘আমি সত্যি একজন পাগল!’

আমি সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। আমি স্বচক্ষে দেখলাম, সুলতান আইয়ুবীর ক্যাম্প থেকে দু’টি মেয়ে মাথা বের করে পাগলের তামাশা দেখার জন্য আমার দিকে তাকিয়ে আছে।’

‘আমরা তাঁর কোন সৈন্যের কাছে কোন মেয়ে দেখিনি।’ এক সৈনিক বললো।

‘তোমরা কি সেই সময় যখন তাঁর সৈন্যেরা দামেশকে গিয়েছিল, তখন তাদের সাথে ছিলে?’ সাদা পোষাকধারী লোকটি প্রশ্ন করলো।

‘আমরা তো এই প্রথমবারের মত এদিক এসেছি।’ এক সিপাই বললো, ‘আমরা সৈন্য বিভাগে নতুন ভর্তি হয়েছি। তখন আমরা সুলতানের বাহিনীতে ভর্তিই হইনি তো সেখানে থাকবো কেমন করে?’

‘আমি পুরাতন সৈন্যদের কথা বলছি।’ লোকটি বললো, ‘সেই কমাণ্ডার ও সৈন্যদের কথাই বলছি, যাদের পাপের শাস্তি তোমাদের মাথার ওপর এসে পড়েছে। তোমরা নতুন তো, সে জন্য কোন পাপের সাথে জড়াতে পারোনি। এ জন্যই তোমরা এখনো জীবিত আছো, নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছো। কিন্তু যারা মুসলমান হয়েও মুসলমানদের বাড়ীতে লুটপাট করেছে ও পর্দনাশীন নারীদের উপর হস্তক্ষেপ করেছে, তারা

সবাই মারা গেছে। আর যারা পাপী ও গোনাহগার তাদের কারো ঠ্যাং কেটেছে, কারো বাহু ও হাত কেটেছে।

তোমরা খবর নিলেই জানতে পারবে, তোমাদের মতই অনেকে রমলা থেকে মিশরে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু পথের মধ্যে তাদের পাপের শাস্তি শুরু হয়ে যায়। তারা ময়দান থেকে জীবিত ফিরলেও পথে অজ্ঞান হয়ে যায়। পরে তাদের দেহ থেকে চোখ শকুনে টেনে বের করেছে।

আরো একদল পাপী ছিল, তারা খৃস্টানদের হাতে বন্দী রয়েছে। এখন সেই বন্দীখানায় তারা তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করছে। এই বন্দীখানার শাস্তি জাহান্নামের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সেখানে তাদের নিরন্তর শাস্তি চলতে থাকবে। তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সেখানে ধুকে ধুকে মরার মত পড়ে থাকবে, কিন্তু মরবে না। তারা মৃত্যুর জন্য দোয়া করবে, কিন্তু তাদের দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।'

'আমাদের পরাজয়ের কারণ কি এটাই?' এক সৈনিক প্রশ্ন করলো।

'আমি দুই বছর আগেই ইশারা পেয়েছিলাম, আইয়ুবীর বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে।' লোকটি বললো, 'তারা নিজেরা ধ্বংস হবে আর কাফেরদেরকে এমন সুযোগ করে দেবে, যেন তারা ইসলামের ধ্বংস সাধন করতে পারে। কারণ এই বাহিনীর প্রতি আল্লাহ নাখোশ হয়ে গেছেন।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' একজন জিজ্ঞেস করলো।

'আমি আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার জন্য রমলা থেকে পালিয়ে এসেছি। রমলায় ক্রুসেড বাহিনীর রূপ ধরে আল্লাহর

গজব নেমে এসেছে। এ গজব মুসলিম বিশ্বকে তছনছ করে দেবে।'

'তাহলে আপনি কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবেন?'

'আমি কোথায় আশ্রয় নেবো সে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধু আমার মুরশিদের হুকুম তামিল করতে পারি। ক্রুসেড বাহিনী তুফানের মত রমলায় আঘাত হানলে মুরশিদ আমাকে জানাল, 'আইয়ুবীর বাহিনী এ তুফান রোধ করতে পারবে না।' তোমরা নিজেরাই এর স্বাক্ষী, ক্রুসেড সৈন্যদের তোমরা বাঁধা দিতে পারোনি।

যদি শুধু আমার জীবনের প্রশ্ন হতো, তবে আমি আমার মুরশিদের মাজারে আমার জীবন কুরবানী করতাম। কিন্তু মুরশিদ আমাকে এই যুবতী মেয়ে দু'টির জীবন ও সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য হিজরত করতে বললেন। কারণ খৃস্টানরা দু'টি জিনিস খুব পছন্দ করে, সম্পদ ও পর্দানশীন মেয়ে। আমার মুরশিদ আমাকে বললেন, 'তোমার মেয়ে দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে মিশর চলে যাও।'

আমি করজোড়ে বললাম, 'এত দূরের পথ আমি কেমন করে পার হবো।'

মাজার থেকে আওয়াজ এলো, 'তুমি এতদিন আমার যে খেদমত করেছো, তার বিনিময়ে তোমরা মঙ্গল মতে কায়রো পৌঁছতে পারবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে না। সবাইকে পাপ থেকে সাবধান করবে। বলবে, যদি বাঁচতে চাও তবে পাপের কাজ ছেড়ে দাও। নইলে তোমরাও সেই শাস্তি পাবে যে শাস্তি আইয়ুবীর সৈন্যদের দেয়া হয়েছে।'

মাজার আমাকে আরো অনেক কথাই বলেছে, সে সব কথা আমি মিশর গিয়ে বলবো।

তোমরা একে অন্যের দিকে লক্ষ্য করে দেখো, তোমাদের চেহারা সব লাশের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তোমাদের দেহে প্রাণের স্পন্দন আছে কি নেই, বুঝার উপায় নেই। কিন্তু আমাকে দেখো, আমি ও আমার কন্যারা পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। আমাদের সাথে খাবারও নেই, পানিও নেই। তবু আমরা কত সতেজ ও প্রাণবন্ত।'

'আপনি কি আমাদেরকে মিশর পর্যন্ত আপনার মত শান্তিতে নিয়ে যেতে পারবেন?' এক সৈনিক জিজ্ঞেস করলো।

'যদি তোমরা খালেছ মনে এই প্রতিজ্ঞা করো, তোমরা পাপের চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলবে, আর আমি যে উদ্দেশ্যে মিশর যাচ্ছি সে ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে, তবে আমি তোমাদেরকে সহিসালামতে মিশর ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবো।'

'আমরা সত্য মনে অঙ্গীকার করছি।' অনেকগুলো কণ্ঠস্বর এক সাথে বলে উঠলো, 'আমরা অঙ্গীকার করছি, যে পর্যন্ত জীবিত আছি, আপনার সাথে থাকবো।'

'আমি শুধু আমার এবং মেয়েদের জীবন ও সম্মান বাঁচানোর জন্য রমলা থেকে বের হইনি।' লোকটি বললো, 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে, মিশরে গিয়ে জনগণকে সাবধান করার জন্য।

মিশরের মাটির একটি দোষ আছে। এই মাটিতে গোনাহের একটা প্রবণতা আছে। হযরত ইউসুফ (আ:)

মিশরে নিলাম হয়েছিলেন। হযরত মুসা (আ:)-এর ওপর অত্যাচার করা হয়েছে মিশরের মাটিতে। মিশরে ফেরাউনের হাতে নির্যাতীত হয়েছে নবী, রাসূল ও পয়গম্বরগণ।'

তিনি বললেন, 'হে মিশরবাসী! তোমরা মাটির এই কুপ্রভাব থেকে বাঁচো এবং এর অনাচার থেকে মুক্ত হয়ে যাও। তোমরা আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, যেন আল্লাহ তোমাদেরকে আর শাস্তিযোগ্য মনে না করেন। তাহলেই তোমরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

আমি মিশরবাসীকে এই বাণী শোনানোর জন্যই যাচ্ছি। যদি তোমরা এই বাণী পৌঁছাতে আমাকে সাহায্য করো, তবে তোমাদের জন্য এই পৃথিবী যেমন জান্নাত হয়ে যাবে তেমনি পরকালেও তোমাদের জন্য খোলা থাকবে বেহেশতের দরোজা।'

০

কায়রোর আকাশ নিরাশার মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। রমলার যুদ্ধে পরাজিত সুলতান আইয়ুবী ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন কায়রো। কায়রোর শহর ও আশপাশের গ্রামগুলোতে গুঞ্জরিত হচ্ছিল একটিই শব্দ, পরাজয়! পরাজয়! পরাজয়!

মানুষের মনে এসে জমা হচ্ছিল অজানা ভয় ও ত্রাস। কেন এ পরাজয় ঘটলো মানুষ তার কিছুই জানতো না। তারা শুধু জানল, রমলার প্রান্তরে চরম মার খেয়ে সুলতান আইয়ুবী তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন।

যে আইয়ুবীর পায়ের নীচে এসে চুমু খেতো বিজয়, সে আইয়ুবী পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে ফিরে এসেছেন কায়রো, এ খবরে কায়রোর মানুষ বিচলিত, স্তম্ভিত।

গুজব ছড়ানোর এটাই মোক্ষম সময়। খৃস্টানদের কাছ থেকে হালুয়-রুটি খাওয়া মুসলিম গাদ্দাররা কোমরে গামছা বেঁধে নেমে পড়ল গুজব ছড়ানোর কাজে। সাধারণ মানুষ সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই সে গুজব বিশ্বাস করতে লাগল। কেবল বিশ্বাস করতে লাগল বললে ভুল বলা হবে, বরং তারা সে গুজব সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছিল কোন কিছু না বুঝেই।

প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন গুজব বের হতে লাগলো। সেসব গুজব বাতাসের মতই দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো কায়রো এবং তার আশপাশের এলাকায়।

আগে থেকেই কায়রোতে খৃস্টান গোয়েন্দা এবং তাদের দালাল ও চরেরা কাজ করছিল। এসব চক্রান্তকারীদের কেউ ইউরোপ থেকে আসেনি, মিশরের মুসলমান নাগরিকরাই তাদের হয়ে এ দায়িত্ব পালন করছিল। এর বিনিময়ে তারা পাচ্ছিল মোটা অংকের টাকা ও নানা উপহার সামগ্রী।

তারা প্রচার করতে লাগলো, ক্রুসেড বাহিনীর হাতে এত বেশী সামরিক শক্তি রয়েছে, দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদের সামনে টিকতে পারবে না।

সুলতান আইয়ুবীর পরাজিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে তারা বলতে লাগলো, এরা সব অপদার্থ ও আরামপ্রিয় সৈন্য। লুটপাটের আশায় তারা সেনা বিভাগে নাম লিখিয়েছিল। এদের দিয়ে কি যুদ্ধ হয়!

তারা সুলতান আইয়ুবীর সামরিক যোগ্যতা নিয়েও নানা প্রশ্ন তুলতে লাগল।

মানুষের স্বভাবটাই এমন, তারা গুজবে কান দিতে ও ছড়াতে ভালবাসে। এই গুজবের গোলকধাঁধায় পড়ে মিশরবাসী আতংক ও ভয়ে একেবারে নাজেহাল হয়ে গেল।

তারা সবচে বেশী আতংকিত হলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক সৈন্যদের দল ছুট অবস্থায় কায়রো ও মিশরে পৌছতে দেখে। এ সৈনিকরা ছিল পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের নতুন ভর্তি করা সিপাই। সামান্য ট্রেনিং দিয়েই এদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল, ফলে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে এরা যে ভয় পেয়েছিল সেই আতংক লেগেছিল ওদের চোখে মুখে।

তকিউদ্দিন সত্যি কথাই বলেছিলেন, গদি ও রাজ্যের লোভে মুসলমান আমীররা যদি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে সেনাবাহিনীকে টুকরো টুকরো না করতো তবে সুলতান আইয়ুবীকে এই আনাড়ি লোক ভর্তি করার ঝুঁকি নিতে হতো না। গৃহযুদ্ধ মুসলিম বাহিনীকে বিভক্ত ও দুর্বল করে দিয়েছিল। সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য সুলতান আইয়ুবীকে নতুন করে সেনাবাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করতে হয়েছিল। যদি গৃহযুদ্ধ না হতো তবে সুলতানকে এই আনাড়ি সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে নামার বিপদ মাথায় নিতে হতো না।

এ ছাড়া কিছু ভুল সামরিক অফিসাররাও করেছিল। তারা নতুন সৈন্যদের সামনে জিহাদের ফজিলত ও গুণাবলী বর্ণনা

না করে সৈন্যদের মধ্যে অর্থের লালসা ও গনিমতের লোভ দেখিয়েছিল। এটাও উচিত হয়নি তাদের।

এইসব পলাতক বাহিনীর সৈন্যরা কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ উট ও ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসছিল। যখন কোন সৈন্য কোন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করতো, তখন লোকেরা তাকে ঘিরে ধরতো। তাকে জিজ্ঞেস করতো যুদ্ধের কথা।

এইসব সৈনিকরা নিজেদের পরাজয়ের গ্লানি দূর করার জন্য কমাণ্ডার ও সেনাপতিদেরকে অযোগ্য ও বিলাসপ্রিয় বলে দোষারোপ করতো। তাদের কেউ বলতো, 'ক্রুসেড বাহিনীর সাথে কোন অলৌকিক শক্তি ছিল, যে শক্তির বলে তারা যেদিকে যেত সেদিক ময়দান সাফ করে দিত।'

কেউ হয়তো বলতো, 'ক্রুসেড বাহিনীর কাছে এমন গোপন অস্ত্র আছে, সে অস্ত্র যেদিকেই ঘুরানো যায় সেদিকই সাফ হয়ে যায়। আর এই অস্ত্রই তাদের বিজয়ের কারণ।'

এ ধরনের গুজব ও অপপ্রচার মিশরের বিভিন্ন মুসলিম এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল।

এসব গুজবের সবই ছিল মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা। এসবের উদ্দেশ্য ছিল, জাতির সামনে সামরিক বাহিনীকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

দ্বিতীয় কারণ ছিল, মুসলমানদের মধ্যে খৃস্টানদের শক্তির প্রভাব ও ভয় জাগিয়ে তোলা, যাতে সুলতান আইয়ুবী নতুন ভর্তিতে কোন সাড়া না পান।

তৃতীয় কারণ, সুলতান আইয়ুবীর ওপর থেকে জাতির আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট করা।

চতুর্থ কারণ, এই দুর্বলতার সুযোগে আরও কিছু লোককে স্বাধীন আমীর ও বাদশাহ্‌র দাবীদার হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা, যাতে আবার গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

সুলতান আইয়ুবী শত্রুদের এই অপতৎপরতা সম্পর্কে ভালমত জ্ঞাত ছিলেন। তিনি কায়রো এসেই তাঁর গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান, পুলিশ প্রধান গিয়াস বিলকিস ও তাদের সহকারীদের ডাকলেন।

তিনি তাদের বললেন, 'শত্রুরা গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। কঠোর হাতে এদের দমন করতে হবে। শত্রুর গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করতে হবে। এই পরাজয়ের যথার্থ কারণ কি তা জনগণের মাঝে তুলে ধরতে হবে।'

০

সূর্য অস্ত যেতে তখনও অনেক দেরী। রমলা থেকে আগত আরও দু'তিনজন সিপাই তাদেরকে অতিক্রম করে চলে গেল। দরবেশ লোকটি বললেন, 'ওদেরকে থামাও, রাত পর্যন্ত ওরা বেঁচে থাকতে পারবে না।'

কয়েকজন দৌড়ে গিয়ে তাদেরকে থামালো। তারা কাফেলার কাছে এসে পানি চাইল। সাদা জোব্বা পরা দরবেশ বললেন, 'পানি তোমাদের কাছে রাতে এসে পৌছবে। ততক্ষণ

তোমরা সেই আল্লাহর স্মরণ করো, যে আল্লাহ তোমাদেরকে রমলা থেকে বের করে নতুন জীবন দান করেছেন।'

কিছুক্ষণ পর দু'টি লোককে দেখা গেল ঘোড়ায় চড়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। দূর থেকেই তারা টিলার আড়ালে কাফেলাটিকে বসে থাকতে দেখলো। যখন তারা কাফেলার খুব কাছাকাছি পৌঁছলো তখন তারা দেখতে পেলো, কাফেলার সাথে বসে আছেন কালো দাড়িওয়ালা জুব্বা পরা এক হুজুর।

ভদ্রলোককে দেখে সাথে সাথেই তারা লাফিয়ে নেমে এলো অশ্বপৃষ্ঠ থেকে। ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে দৌড়ে জুব্বা পরা লোকটির সামনে পৌঁছে দু'জনে নতজানু হয়ে সিজদা করলো। পরে তার হাতে চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'হে মুরশিদ, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

লোকটি মিষ্টি করে হাসল। তারপর সৈনিকদের দেখিয়ে বলল, 'এদের সাথে একটু সফর করছি।'

এ উত্তর শুনে অশ্বারোহী দু'জন সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনারা বড় ভাগ্যবান। আল্লাহর এই সম্মানিত ওলির সান্নিধ্য পেয়েছেন আপনারা।'

তারা আরো বললো, 'এই মুরশিদ এক বছর আগে এখানে বসেই আমাদের বলেছিলেন, মিশরের একদল পাপী সৈন্য রমলায় আসবে। তারা রমলায় এসে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে যারা ভাগ্যবান তারা সেই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বেঁচে দেশে ফিরে যেতে পারবে। তোমরাই তাহলে সেই ভাগ্যবান সৈনিক?'

এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগেই দরবেশ লোকটি বলে উঠলো, 'তোমরা লক্ষ্য রাখবে, কোন মিশরী সৈনিককে দেখতে পেলে তাকে এখানে নিয়ে আসবে। রাতে এখানে কেউ ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকবে না।'

রমলা থেকে মিশর যাবার এই একটিই রাস্তা। যাত্রীদের চলাচলের উপযোগী আর কোন রাস্তা নেই। সব এলাকাই শুধু টিলায় পরিপূর্ণ। সেই টিলার আড়ালে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পড়ে আছে। কিন্তু তার ভেতর প্রবেশ করা শুধু বৃথা নয়, অনেক বিপদও সেখানে ওঁৎ পেতে আছে। বাইরে থেকেই বুঝা যায়, ওখানে পানির কোন চিহ্নমাত্র নেই।

কাফেলার যাত্রীদের সামনে তখন মৃত্যুর বিভীষিকা বিরাজ করছিল। মিশর সেখান থেকে তখনও অনেক দূরে। এই লোকদের দরকার ছিল একটু আশ্রয়। দরকার ছিল সামান্য খাবার ও একটু পানি। মুরশিদরূপী লোকটি তাদের সামনে বসেছিল। তারা আশা করছিল, এই লোক অলৌকিক ক্ষমতাবলে তাদের জন্য একটু পানি ও খাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

লোকটির প্রতিটি কথা সবাই নিজ নিজ মনের ভেতর গেঁথে নিচ্ছিল। কিন্তু শুধু আশা আর আশ্বাসে কারো পিপাসা নিবারণ হচ্ছিল না। অবস্থা এমন হল যে, পিপাসার তাড়নায় দু'তিন সিপাইয়ের মুর্ছা যাওয়ার উপক্রম হলো। লোকটি খাবার ও পানির বদলে তাদের তখনো শান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

সূর্য অস্ত গেল। মরুভূমিতে নেমে এলো আঁধার রাত। রাত গভীরতার দিকে এগিয়ে চলল, কিন্তু খাদ্য বা পানীয় কিছুই এলো না। কাফেলার মুখগুলো হতাশায় মুষড়ে পড়ল। তাদের তখন করার কিছুই ছিল না। টিলার পাশে নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল লোকগুলো। কোথাও কোন আওয়াজ নেই। নেই প্রাণের সামান্য স্পন্দন। এমনকি মরু শেয়ালের একটু ডাকও ভেসে এলো না কোথাও থেকে।

অনেক রাতে, যখন গভীর নীরবতার মধ্যে ডুবে ছিল নিঃসঙ্গ মরুভূমি, তখন পাশেই কোথাও পাখী ডেকে উঠল। সবাই চমকে উঠলো। এমন জাহান্নামে, যেখানে পানি নেই, বৃক্ষ নেই, নেই কোন পশু বা প্রাণীর স্বাক্ষর, সেখানে পাখী এলো কোত্থেকে! যেখানে প্রাণহীন নিস্তব্ধতার কারণে তাদের মাথার উপর মৃত্যু ঝুলছে, সেখানে পাখীর আওয়াজ কল্পনাও করা যায় না।

এ আওয়াজ শোনার সাথে সাথেই কাফেলার লোকগুলোর নিঃশ্বাসের আওয়াজও যেন থেমে গেল। দম বন্ধ করে সবাই ভাবল, এটা পাখীর আওয়াজ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই এটা কোন ভৌতিক ব্যাপার।

'আল্লাহ, তোমার মেহেরবাণীর কোন তুলনা নেই। হাজার বার, লক্ষ-কোটি বার এ জন্য তোমার দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাই!' পীর সাহেব স্বস্তির নি:শ্বাস নিয়ে বললেন, 'আমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে।'

লোকটি তার সামনে বসা দু'জন সৈনিককে বললো, 'তোমরা দু'জন ওদিকে যাও। এখান থেকে গুণে চল্লিশ কদম

এগিয়ে ডান দিকে ঘুরবে। ওখান থেকে গুণে চল্লিশ কদম এগিয়ে গেলে সামনে কোথাও আগুন জ্বলছে দেখতে পাবে। সেই আলোর পাশে গেলে তোমরা সেখানে কিছু পানি ও খাবার পাবে। সেখানে যাই কিছু পড়ে থাক, উঠিয়ে নিয়ে আসবে। এই আওয়াজ কোন পাখীর নয়, এটা এক গায়েবী ইশারা।'

'আমি যাবো না।' এক সিপাই ভয় পেয়ে বললো, 'আমি জ্বীনদের ভয় পাই।'

ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পরে যে দু'ব্যক্তি এসেছিল তারা দু'জন উঠে দাঁড়াল।

'হুজুর, আমরা যাই?'

হুজুর বললেন, 'যাও, একদম ভয় পাবে না। এই জ্বীন তোমাদের দুশমন নয়, বন্ধু। নইলে তোমাদের এই দুঃসময়ে তারা তোমাদের জন্য কষ্ট করে খাবার বয়ে নিয়ে আসতো না।'

তারা প্রথমে হুজুরকে গিয়ে সিজদা করলো। তারপর মাথা তুলে সৈনিকদের লক্ষ্য করে বললো, 'ভয় পেয়ো না। এ জ্বীন আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। হুজুর যেখানে যান সেখানে তাকে খাবার ও পানি পৌছানোই এদের দায়িত্ব। আমরা তার মোজেজা সম্পর্কে জানি। দুই তিনজন চলো আমাদের সঙ্গে, নইলে সবার খাবার আমরা বয়ে আনতে পারবো না।'

তারা দু'তিন জন সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাত্রা করলো। পীর সাহেবের নির্দেশ মত তারা কদম গুণে ও মোড়

ঘুরে দুই টিলার মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেল। সামনে এক স্থানে তারা সত্যি আগুন জ্বলতে দেখলো। সকলে দোয়া কালাম পাঠ করতে করতে অগ্রসর হলো সেই আগুনের দিকে।

সেখানে তারা চার-পাঁচটা পানির মশক ও প্রচুর খাবার প্যাকেট দেখতে পেল। তারা সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে এসে হুজুরের সামনে রেখে দিল।

হুজুর সবাইকে ডেকে তাদেরকে গোল হয়ে বসতে বললেন। সবাই বসলে তিনি সেই খাবার সবার মাঝে ভাগ করে দিলেন। দু'টি পানির মশক সৈনিকদের কাছে দিয়ে বললেন, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পান করবে না। পানি কম খেয়ে সঞ্চিত রাখার চেষ্টা করবে।'

এর পরে আর কারো সন্দেহের কোন অবকাশ থাকলো না, কালো দাড়িওয়ালা হুজুর আসলেই কামেল পীর! আল্লাহর সঙ্গীদেরই একজন। হুজুর সবাইকে তায়াম্মুম করালেন ও জামায়াতসহ নামাজ পড়ালেন। তারপর সকলেই শুয়ে পড়লো।

ভোরের আলো ফোটার আগেই হুজুর আবার সবাইকে জাগিয়ে দিলেন। ফজরের নামাজের পর কাফেলাকে নিয়ে মিশরের দিকে যাত্রা করলেন। পীর সাহেব এক উটে ও তার দুই মেয়ে দুই উটে সওয়ার হলো। চলতে শুরু করলো কাফেলা।

রাস্তায় আরও তিন চার জন সৈনিক এসে কাফেলায় যোগ দিল। সবারই গন্তব্য মিশর। পথে হুজুর তাদেরকে পানি পান করতে দিলেন। সবাইকে খেজুর খাওয়ালেন।

এ সময় তাদের পেছন থেকে আরেকটি কাফেলা এগিয়ে এলো এবং তাদের থেকে সামান্য দূর দিয়ে সেই কাফেলা মিশরের দিকে এগিয়ে গেল। কেউ একজন বললো, 'তাদেরকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে নেই।'

হুজুর বললেন, 'ওরা মনে হয় আমাদের মত রমলা থেকে পালিয়ে আসেনি। তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক করা ঠিক হবে না। যেতে দাও ওদের।'

০

কয়েকদিন পর এই কাফেলা পীর সাহেবের নেতৃত্বে মিশরের সীমান্তে প্রবেশ করলো। সেই দুই লোক, যারা হুজুরের সামনে সিজদা করেছিল, তারা সারা রাস্তায় হুজুরের কেরামতির নানা কাহিনী বর্ণনা করে লোকদেরকে চমৎকৃত করে তুলল।

তারা সৈন্যদের বললো, 'যদি কোন লোক হুজুরকে তার বাড়ীতে থাকার জন্য রাজি করাতে পারে তবে তার এবং সেই গ্রামের কারো রিজিকের কোন অভাব হবে না। আল্লাহ তাদের উপরে সব সময় সদয় থাকবেন।'

এই কাফেলায় একই গ্রামের তিন চার জন সৈনিক ছিল। তারা সবাই মিলে পরামর্শ করলো, 'হুজুরকে আমাদের গ্রামে নিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'ভালই তো! হুজুর কি রাজি হবেন?'

'চেষ্টা করতে দোষ কি! যদি রাজি করাতে পারি তবে আমাদের রুজি-রোজগার নিয়ে আর কোন চিন্তা থাকে না।'

'ঠিক বলেছো, চলো হুজুরকে বলে দেখি।'

'হুজুরকে নয়, চলো ওই দু'জনকে গিয়ে ধরি। তারা বললে হুজুর সহজেই রাজি হয়ে যাবেন।'

'তাই ভাল। চলো তাই করি।'

তারা গিয়ে ওই লোক দু'জনকে বললো, 'আমরা হুজুরকে আমাদের গ্রামে নিতে চাই। আপনারা যদি একটু সুপারিশ করেন আমরা ধন্য হবো।'

তারা বললো, 'বেশ তো, আমরা হুজুরকে বলে দেখি তিনি রাজি হন কিনা?'

তারা দু'জন হুজুরের কাছে গেল। বলল, 'হুজুর, এই লোকেরা আপনাকে ওদের গ্রামে নিতে চায়। তাদের ইচ্ছা, আপনি ওদের ওখানে থেকেই আপনার বাণী প্রচার করেন। তারাও সাধ্যমত আপনার সাথে সহযোগিতা করবে।'

হুজুর বললেন, 'আমাকে প্রথম ওরাই দাওয়াত করলো, এ দাওয়াত আমি অগ্রাহ্য করি কি করে? ঠিক আছে, আমি তাদের দাওয়াত কবুল করলাম।'

কায়রো শহরের পাশেই বড়সড় একটা গ্রাম। সে গ্রামই ছিল ওদের ঠিকানা। কাফেলা সে গ্রামে গিয়ে প্রবেশ করলো। সৈন্যদের দেখে গ্রামবাসী ছুটে এলো। দেখতে দেখতে এ বাড়ী ও বাড়ী খবর হয়ে গেল। সৈন্যদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের লোকেরা ছুটে এলো। কাফেলা গ্রামের মাদ্রাসার

বিশাল মাঠে গিয়ে থেমে গেল। গ্রামবাসী ও সৈন্যদের আত্মীয় স্বজন ঘিরে ধরলো কাফেলাকে।

লোকজন কাফেলার উট ও ঘোড়া এক পাশে সরিয়ে নিল। কাফেলার লোকদের আহার ও পানির ব্যবস্থা করলো। ওদের খাওয়া শেষ হলে সবাই যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা শোনার জন্য গোল হয়ে বসে গেল।

সৈন্যরা যুদ্ধের কথার চাইতে হুজুরের কেরামতির কাহিনীই বেশী শোনাল লোকজনকে। তারা বলল, 'তিনি একজন কামেল পীর ও আল্লাহর অলি। জ্বীনেরা এই অলির বশে থাকে। রমলা থেকে আসার পথে আমরা যখন ক্ষুধা ও পিপাসায় একেবারে কাতর হয়ে পড়লাম তখন পথে তাঁর সাথে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেখা হয়ে গেল।

তিনি জ্বীনকে হুকুম করলেন আমাদের খাবার ও পানি সরবরাহ করার জন্য। জ্বীনেরা অদৃশ্য থেকে আমাদের খাবার এনে দিল। হুজুর যদি আমার খাবার ও পানির ব্যবস্থা না করতেন তবে আমরা পথেই মরে পড়ে থাকতাম। আমাদের পক্ষে আর কোনদিনই বাড়ী ফেরা সম্ভব হতো না।'

হুজুর চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় এক গাছের নিচে বসে রইলেন। তার মেয়ে দু'টিকে গ্রামের এক সিপাই তার বাড়ীতে নিয়ে গেল।

'যুদ্ধক্ষেত্রের রহস্য আমাকে জিজ্ঞেস করো!' ধ্যানমগ্ন অবস্থা থেকে চোখ মেলে হুজুর বললেন, 'এরা সিপাহী, এরা শুধু যুদ্ধ করে। এরা জানতে পারে না, যারা ওদের দিয়ে যুদ্ধ করায় তাদের নিয়ত কি। এই কয়েকজন সৈন্য যাদের আমি

মরুভূমির জ্বলন্ত আগুনের মধ্য থেকে বের করে এনেছি, তারা সেইসব সৈন্যের পাপের শাস্তি ভোগ করেছে, যারা যুদ্ধের নামে মুসলিম জনপদে লুটতরাজ ও নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করেছিল।

তারা সবাই ছিল আইয়ুবীর বাহিনীর। তারা প্রতি ময়দানেই সফলতা লাভ করতো। তারা কোন অঞ্চল দিয়ে গেলে সেই অঞ্চলের মাটি এবং বৃক্ষলতাও তাদের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিত। আইয়ুবীর গুণগানে ফেটে পড়তো।

কিন্তু ক্রমাগত বিজয় তাদের অহংকারী করে তুলল। তারা তখন লুটতরাজ শুরু করল। সেখানকার নারীরা মিশরের নারীদের চেয়ে সুন্দরী ছিল। বিজয়ের গর্বে তারা সেই মেয়েদের ইজ্জত লুটিতে শুরু করল। তাদের মধ্য থেকে মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণের চিন্তা দূর হয়ে গেল। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে ফেরাউনের মত অহংকারী বানিয়ে নিল।

তাদের মস্তিষ্কে গণিমতের মাল ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না। এই বাহিনীর সেনাপতি, কমাণ্ডার ও সৈন্যরা জাতির সম্মান ও ইজ্জতকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। তারা মুসলমানদের বাড়ীতে লুটপাট করেছে। সুন্দরী নারী ও যুবতীদের ধরে নিয়ে বেইজ্জতি করেছে। এইসব পর্দানশীন মুসলিম মেয়ের আর্তনাদে কেঁপে উঠেছে আল্লাহর আরশ। ফলে সুলতান আইয়ুবীর ওপর আল্লাহর যে রহমত ছিল তা উঠে গেল। সেখানে নেমে এলে আল্লাহর গজব।

সুলতানের বাহিনীতে নাম লিখিয়ে এইসব সৈন্যরা যখন যুদ্ধ করতে গেল তখন আল্লাহর গজব ঘিরে ধরলো তাদের।

এদের ভাগ্য ভাল, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসার ফলে আল্লাহর গজব থেকে বেঁচে গেল তারা। আল্লাহ আমাকে ইশারা করলেন তাদের হেফাজতের জিম্মা নিতে।

তখন আমি তাদের কাছে গেলাম। তাদেরকে খাবার ও পানি সরবরাহ করলাম। তারা আল্লাহর অসীম রহমতের কারণে আবার ঘরে ফিরে আসতে পারল।'

'সুলতান আইয়ুবী কি অন্ধ হয়ে গেছেন? তিনি দেখেন না এসব?' কেউ একজন রাগের সাথে বললো, 'তিনি কি চোখ বুঝে থাকেন, তার সৈন্যরা কি করছে তার খোঁজ রাখেন না?'

'আল্লাহ যখন কাউকে শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার বিবেক ও চোখের উপর পর্দা টেনে দেন।' হুজুর বললেন, 'সুলতান আইয়ুবী নিজে বিজয়ের নেশায় এতটাই মাতাল ছিলেন যে, কখন যে তার মধ্যে ফেরাউনের প্রেতাত্মা আছর করেছে, নিজেই টের পাননি। তাই তো তিনি আল্লাহ ও আল্লাহর বিধানের কথা ভুলে গেছেন। তাকে তার রক্ষী ও বিলাসপ্রিয় সেনাপতিরা এমনভাবে ঘিরে রেখেছে, কোন অভিযোগকারী ও মজলুমের আবেদন তার কানে পৌঁছতে পারে না।

যে বাদশাহর কাছে জনগণের ফরিয়াদ ও নালিশ পৌঁছতে পারে না, আল্লাহর রহমত তার কাছ থেকে সরে যায়। যখন বাদশাহ ন্যায় বিচারের দরজা বন্ধ করে রাখেন আল্লাহ তখন তার বিচারের ভার নিজ হাতে নিয়ে নেন। তখন তার ওপর নেমে আসে আল্লাহর গজব। জেনে বা না জেনে যারাই তার

সহযোগিতা করতে যায়, তারাই সেই গজবের শিকার হয়ে যায়।

গত দুই বছর যাবত আমার কাছে ইশারা আসছিল, যদি এই বাহিনী তাদের পাপ কাজ বন্ধ না করে, তবে শীঘ্রই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অদৃশ্য থেকে এই খবর বার বার আমার কানে আসছিল, কিন্তু আফসোস, যার জন্য এই বাণী, তিনি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও আমি তার সাথে দেখা করতে পারিনি। ফলে আল্লাহর অনিবার্য গজব ঘিরে ফেলল তাকে এবং তার বাহিনীকে।

যে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আল্লাহর রহমতের বদৌলতে সকল যুদ্ধক্ষেত্রেই ছিলেন অপরাজেয়, খৃস্টানরা যাকে যুদ্ধের দেবতা বলতো, তিনি জ্ঞান-বুদ্ধি এমন ভাবে হারালেন যে, তিনি যুদ্ধের সকল চাল ভুলে গেলেন। আর তারই রণকৌশল শত্রুরা গ্রহণ করে তাকে চরমভাবে পরাজিত করলো। পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে তিনি একাকী মিশরে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন।'

'আমরা এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো।' একজন আবেগপ্রবণ গ্রাম্য লোক বললো, 'খৃস্টানদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে। বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই করতেই থাকবো। দরকার হলে আমি আমার সন্তানকেও আল্লাহর পথে কোরবান করে দেবো।'

'জয় ও পরাজয় সবই আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়?' হুজুর বললেন, 'যারা এ কথা বিশ্বাস করে না, তারা মুসলমান থাকতে পারে না। যদি তোমরা মুসলমান হও তবে তোমাদের

বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। সেই আল্লাহই আইয়ুবী ও তার বাহিনীর ভাগ্যে পরাজয় লিখে রেখেছেন। সারা দুনিয়া এক হয়ে চেষ্টা করলেও আল্লাহর ফয়সালা কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না।

আমি এ কথা বলতেই তোমাদের কাছে এসেছি, মিশরের প্রতিটি শিশুও যেন প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু আইয়ুবীর বাহিনীতে শামিল হয়ে এ প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। কারণ তাদের শাস্তির মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। তোমরা যদি এখন তোমাদের সন্তানদের সেনাদলে ভর্তি করে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দাও, তবে তারা অকাতরে মারা পড়বে। তারা সকল ময়দানেই পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করবে।

সব কাজের জন্যই একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে। সে সময় না এলে যতই চেষ্টা করো সে কাজটি তুমি সমাধা করতে পারবে না। তুমি ইচ্ছে করলেই যখন তখন খেজুর গাছে খেজুর ফলাতে পারবে না। আজ বিয়ে করে কালই তুমি সন্তানের বাপ হতে পারবে না। তেমনি খৃস্টানদের পরাজিত করার জন্যও আমাদেরকে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এখনও সে সময় আসতে অনেক দেরী।

আল্লাহ্ বার বার মুমিনদের ধৈর্য ধরার তাগিদ দিয়েছেন। তোমরা যদি সেই ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারো তবেই তোমরা পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে পারবে। এখন সবার আগে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো। তার কাছে তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাও। ক্ষমা চাও তোমাদের

সেইসব সন্তানদের জন্য, যারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়ে গেছে। যতক্ষণ আইয়ুবী ও তার বাহিনীর পরিবর্তে নতুন কোন শক্তি ময়দানে না আসবে, ততক্ষণ তোমাদের দুর্ভাগ্যের রজনী কোনদিন শেষ হবে না।'

০

'পরাজয়ের যাবতীয় দায়িত্ব তোমরা আমার উপর অর্পণ করো!' সুলতান আইয়ুবী বললেন। তিনি তাঁর সেনাপতি, সহ-সেনাপতি, কমাণ্ডার ও প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তাদের সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'পরাজয়ের কারণগুলো খুবই স্পষ্ট। আমার সবচেয়ে বড় ভুল, আমি নতুন ভর্তি করা আনাড়ি সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু যদি আমি বেশী দেরী করতাম বা মিশরে বসে অপেক্ষা করতাম, তবে শত্রুরা একের পর এক আমাদের সব কেল্লা ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তা দখল করে নিতো।

আমি সৈন্যদের যে ঘাটতি নতুন ভর্তি সৈন্য দিয়ে পূরণ করেছিলাম, তোমরা ভাল করেই জানো, সে জন্য দায়ী কারা। কিন্তু আমি এখন কোন্ ভুলের দায়িত্ব কার উপর বর্তায় এ নিয়ে বিতর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাই না।

যদি ভুলের অপরাধ চাপাতে চাও, তবে আমার উপরে চাপাও। কারণ সৈন্যদের কমাণ্ড আমিই করেছি। যদি চালে

ভুল থাকে তবে সে ভুলও আমার। সে ভুলের কাফফারা আমাকেই দিতে হবে এবং আমিই সেটা পূরণ করবো।

জয় ও পরাজয় প্রত্যেক যুদ্ধেরই একটা অনিবার্য পরিণতি। এখন আমি সেই পরিণতির শিকার হয়েছি, যা আমাদের কাঙ্খিত ছিল না। এমন পরিণতির জন্য তোমরাও মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত ছিলে না। তাই তোমাদের চেহারায় হতাশার ছাপ।

যদি তোমরা আমাকে পরাজয়ের জন্য শাস্তি দিতে চাও, সে শাস্তি মাথা পেতে নেয়ার জন্য আমি প্রস্তুত। আমার কানে এ কথাও এসেছে, আমার সৈন্যরা নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট, লুটপাট ও মদপানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কেউ কেউ এ কথাও বলেছে, বাগদাদের খলিফার উপর বিভীষিকা আরোপের জন্য আমি স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করেছি। কেউ আবার আমাকে অহংকারী ফেরাউন বলে অভিহিত করেছে।

আমি এসব অভিযোগের কোন উত্তর দেবো না। এসব দোষারোপের জবাব দেবে আমার তলোয়ার। এবং শীঘ্রই তা দেবে। আমি কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করবো, এ পাপ কে করেছিল, যার শাস্তি আমাকে ও আমার সেনাবাহিনীকে নিতে হচ্ছে।'

আইয়ুবীর বক্তব্য তখনো শেষ হয়নি, প্রহরী ভেতরে ঢুকে এক অফিসারের কানে কানে কিছু বললো। অফিসার উঠে আইয়ুবীর কাছে গিয়ে আস্তে করে বললো, 'হিম্মত থেকে কাসেদ এসেছে।'

সুলতান আইয়ুবী কথা থামিয়ে জলদি তাকে ভেতরে নিয়ে আসতে বললেন। ধূলোবালিতে একাকার ও পথযাত্রায় ক্লান্ত শ্রান্ত কাসেদ সুলতান আইয়ুবীর সামনে এসে তকিউদ্দিনের চিঠি হস্তান্তর করলো। সুলতান আইয়ুবী চিঠিটি খুলে পড়তে শুরু করলেন। উপস্থিত সকলে তাকিয়েছিল সুলতান আইয়ুবীর চেহারার দিকে। তার চেহারা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছিল। কখনো উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল আনন্দে, কখনো বিমর্ষতা গ্রাস করছিল সেই মুখ।

তিনি চিঠিটি পড়ে শেষ করলেন। তার চোখে তখন অশ্রু টলমল করছে। এ অশ্রু আনন্দ না বেদনার উপস্থিত কেউ তা জানে না। তারা অভিভূত হয়ে দেখছিল সুলতানকে। তিনি পত্রটি এক সেনাপতির হাতে দিয়ে বললেন, 'এ চিঠি সকলকে পড়ে শোনাও।'

সেনাপতি পত্র পাঠ করতে শুরু করলো। যতই সে এগুচ্ছিল ততই আবেগ এসে চেপে ধরছিল তার কণ্ঠ। তার সে আবেগ সংক্রমিত হচ্ছিল ভর জলসায়। উপস্থিত সকলের চোখই অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

চিঠি পড়া শেষ হলো সেনাপতির। দেখা গেল প্রায় সবার চোখ থেকেই গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। সেই কান্নাকাতর কম্পিত কণ্ঠে কেউ একজন কোনরকমে উচ্চারণ করলো, 'জিন্দাবাদ।' সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকের সম্মিলিত আওয়াজ শোনা গেল, 'জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!'

'এওতো অপরাধী ও পাপীদের কৃতিত্ব!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তোমরা যারা কায়রো আছো, তারা জানো না

তকিউদ্দিনের কাছে কি পরিমাণ সৈন্য ছিল। তোমরা এটাও জানো না, বিলডনের বাহিনী ছিল দশ গুণেরও বেশী। তার অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় বাহিনীই ছিল বর্মাচ্ছাদিত। তকিউদ্দিনের সৈন্যরা কি প্রমাণ করে দিল না, আমরা পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে পারি? এখনও কি তোমরা মনে করো, মাথায় হাত দিয়ে আমাদের বসে থাকতে হবে?'

সমস্বরে সবাই বলে উঠল, 'না।'

'তাহলে এবার তোমরা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে লেগে যাও। প্রবল উৎসাহে নতুন সৈন্য ভর্তি করো। মুসলমানদের প্রথম কেবলা তোমাদের ডাকছে। আমি শত্রুদের সাথে কোন আপোষ-মীমাংসা বা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাজি নই।'

তকিউদ্দিনের সামান্য একটি পত্রই সুলতান আইয়ুবী ও তার সৈন্যদের মনোবল বাড়িয়ে দিল। তাঁর সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের আহত মনোবল তরতাজা করে দিল।

যুদ্ধে পরাজয় এবং বেশুমার গুজবের ফলে অনেকের মনে সুলতান আইয়ুবী ও তাঁর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সন্দেহ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এই পত্র সেই ক্ষোভ ও দুঃখ ধীরে ধীরে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল।

তকিউদ্দিন বসে ছিলেন না। তিনি তার বাহিনীকে ত্রিশ-চল্লিশ জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে দিলেন। এসব খণ্ড দলগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে পাঠিয়ে দিলেন বিলডনের বাহিনী যেখানে গিয়ে ক্যাম্প করেছে সেখানে। এইসব

বাহিনীকে তিনি বললেন, 'কখনোই শক্তি ক্ষয় করবে না। ঝটিকা কমাণ্ডো আক্রমণ চালাবে এবং চকিতে পালিয়ে আসবে। শত্রুকে সব সময় সন্ত্রস্ত রাখবে, যাতে তারা অভিযান চালাতে না পারে, আবার শান্তিতেও বসে থাকতে না পারে।'

এরই মধ্যে বিলডনের বাহিনীর অনেক ক্ষতি হয়েছিল। তিনি এই আশা নিয়ে বিশাল বাহিনীসহ অভিযানে বেরিয়েছিলেন যে, তিনি দামেশক পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তার অধিকারে নিয়ে নেবেন। কিন্তু তার সে আশা কল্পনা হয়ে উড়ে গেল আকাশে। এখন তার অবস্থা এমন হলো, প্রত্যেক রাতেই কোন না কোন ক্যাম্পে তকিউদ্দিনের সৈন্যরা কমাণ্ডো আক্রমণ চালাতে লাগল। এতে দিনদিনই তার ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে চলল।

বিলডন তার সৈন্য দলকে রাতে পাহারা জোরদার করার হুকুম দিল। তকিউদ্দিনের কমাণ্ডো বাহিনীকে ধরার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ছড়িয়ে দিল বিভিন্ন দিকে। কিন্তু তাতে খুব লাভ হলো না। প্রতি দিনই সকালে বিলডনকে শুনতে হয়, আজ রাতে অমুক ক্যাম্পে আক্রমণ হয়েছিল, অমুক ক্যাম্প আজ রাতে লুট হয়ে গেছে।

বিলডন পালিয়ে গিয়ে যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল, সে এলাকাটা ছিল পাহাড়ী পার্বত্য অঞ্চল। এতে বিলডনের চাইতে তকিউদ্দিনের কমাণ্ডো বাহিনীরই সুবিধা হলো বেশী।

কিন্তু যুদ্ধ যুদ্ধই। কমাণ্ডো আক্রমণের জন্য তকি উদ্দিনকেও কম মূল্য দিতে হচ্ছে না। এমনিতেই তার বাহিনী ছোট। তার ওপর প্রতি রাতেই কমাণ্ডো আক্রমণ চালাতে

গিয়ে দিন দিন তার সৈন্য সংখ্যাও অল্প অল্প করে কমে যাচ্ছিল। কমাণ্ডো আক্রমণ চালিয়ে তারা যখন শত্রু ক্যাম্পের ভেতরে চলে যেত, তখন ফেরার পথে দেখা যেতো তাদের কোন না কোন সৈনিক শহীদ হয়ে গেছে।

তকিউদ্দিনের হাতে এমন সংখ্যক সৈন্য ছিল না যে, তিনি কোন এলাকা দখল করে নিজের করায়ত্বে রাখতে পারেন। আবার এমন অবস্থাও ছিল না, শত্রুকে তার অবস্থান থেকে বিতাড়িত করতে পারেন। তাই এ কমাণ্ডো হামলা করা ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিল না।

এই কমাণ্ডো হামলার উপকার মোটেই তুচ্ছ ছিল না। কমাণ্ডোদের ভয়েই বিলডন কোন দিকে অভিযান চালাতে পারছে না। যদি বিলডন অগ্রাভিযান চালাতো তবে তকিউদ্দিনের এই ক্ষুদ্র বাহিনী তাদের সামনে বেশী সময় টিকতে পারতো না। কিন্তু বিলডন জানতো না, তকিউদ্দিনের হাতে কি পরিমাণ শক্তি অবশিষ্ট আছে।

তকিউদ্দিন আরো একটি কাজ করলেন। বিলডনের রসদপত্র সবই তিনি দখল করে নিলেন। বিলডন বাধ্য হয়ে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য স্থানীয় লোকদের দ্বারস্থ হলেন। এইসব সামগ্রী সরবরাহকারীদের মধ্যে তকিউদ্দিন গোয়েন্দা ঢুকিয়ে দিলেন। তারা শত্রুদের সর্বশেষ অবস্থাও প্রতিদিনই তকিউদ্দিনকে জানিয়ে দিতে লাগল।

একদিন এই গোয়েন্দাদের একজন শত্রুদের বিরাট খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিল। এই খড় তারা সংগ্রহ করেছিল

তাদের ঘোড়া ও উটের জন্য। এভাবেই চলছিল তকিউদ্দিনের অপারেশন।

একদিন তকিউদ্দিন সংবাদ পেলেন, দামেশক থেকে সামান্য সৈন্য ও কিছু রসদ আসছে। হলব থেকে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা তাকে ত্যাগ করতে হলো। আল মালেকুস সালেহ পত্রের উত্তরে লিখলো, 'সম্রাট ফ্রাঙ্ক হারান দুর্গ অবরোধ করতে চান। যদি তিনি তাই করেন, তবে বাধ্য হয়ে হলবের সৈন্যদেরকে তার মোকাবেলা করতে হবে। এই অবস্থায় আপনার সাহায্যে এখন কোন সৈন্য পাঠাতে অপারগ আমি।'

০

কমান্ডো বা গেরিলা অপারেশনে তকিউদ্দিনকে অনেক বেশী মূল্য দিতে হচ্ছিল। কিন্তু তার বাহিনীর মনোবল ও জোশ এমন ছিল, কোন বিপদকেই তারা পরোয়া করতো না। ডিউটির ব্যাপারে তার সৈন্যরা ছিল সজাগ ও সতর্ক। এক মুহূর্তের জন্যও তারা ময়দান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে প্রস্তুত ছিল না।

অধিকাংশ সৈন্য ক্রমাগত জঙ্গল, পাহাড় ও প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াতো দুশমন এবং তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার একটু সুযোগ। এমনকি তারা জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ক্যাম্পেও ফিরে আসতে চাইতো না। তারা চিতাবাঘের মতই শিকারের

অন্বেষণে ব্যস্ত থাকতো। আর হাতের কাছে শিকার পেলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো চিতাবাঘের মতই ক্ষীপ্র ও বেপরোয়া। এতে তাদের জীবনের নিরাপত্তা আদৌ আছে কিনা সে কথা কেউ চিন্তাও করতো না। তারা এতটাই বেপরোয়া ছিল যে, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তাদের মনে কোন দুঃখ বা চিন্তা ছিল না।

তাদের মাত্র একটাই লক্ষ্য, কেমন করে শত্রুর অধিক থেকে অধিকতর ক্ষতি সাধন করা যায়। দুশমনের মোকাবেলা করতে গিয়ে যদি তাদের জীবন যায় কিংবা গুরুতর আহত হতে হয়, তাহলে তাকে তারা বিপদ মনে না করে নিজের ওপর আল্লাহর রহমত মনে করতো। ভাবতো, আল্লাহ তাকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করে নিয়েছেন।

এভাবেই তাদের রাতগুলো ময়দানে ও নির্জন পাহাড়ে, অরণ্যে অতিবাহিত হতো। ক্রুসেড বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা এতটাই মারমুখী হয়ে উঠেছিল যে, সময় মত নাওয়া খাওয়ার কথাও তারা প্রায়ই ভুলে যেতো।

ওদিকে কায়রোর অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। কায়রো ও তার আশপাশের এলাকাগুলোতে গুজবের তুফান বইছিল। কে যে এই গুজব ছড়াচ্ছে তা সনাক্ত করা যাচ্ছিল না। কারণ কম-বেশী সবাই গুজব ছড়াচ্ছিল। কেউ ছড়াচ্ছিল বুঝেশুনে আবার কেউ ছড়াচ্ছিল না বুঝে। কেউ কেউ এমনও ছিল, গুজব থামাতে গিয়ে সে আরো বেশী করে ছড়িয়ে দিচ্ছিল গুজব। যেমন, কারো সাথে দেখা হলো, আর সে লোকটিকে বলে দিল, 'আর যাই বলো, আইয়ুবীর সৈন্যরা নারীদের ওপর হাত তুলেছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

যে লোকটি এ কথা শুনলো, হয়তো আইয়ুবীর সৈন্যরা নারীদের ওপর হাত তুলেছে এ অভিযোগটিই সে ইতিপূর্বে শোনেনি। অভিযোগটি বক্তার মত সেও বিশ্বাস করেনি, তাই ক্ষিপ্ত হয়ে সে তার পরিচিত কাউকে গিয়ে বললো, 'আচ্ছা, মানুষের আক্কেলটা কি বলো দেখি! একটা যুদ্ধে না হয় হেরেই গেছে, তাই বলে তারা নারী নির্যাতন করেছে এমন মিথ্যা অভিযোগ কিভাবে মানুষ আইয়ুবীর ওপর আরোপ করে, বলো দেখি?' এভাবে তৃতীয় ব্যক্তিটিও জেনে গেল আইয়ুবীর ওপর আরোপিত একটি মিথ্যে অভিযোগ।

এভাবে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে গুজব ও অপপ্রচার খুব জোরেশোরেই চলছিল। যে গুজবটি খুব তোড়েজোড়ে চলছিল তাহলো, মুসলিম মুজাহিদরা এখন পাপিষ্ট ও বিলাসপ্রিয় হয়ে গেছে। রমলার পরাজয় তাদের সে পাপেরই শাস্তি।

কায়রোর ইন্টেলিজেন্স এসব গুজবের উৎপত্তিস্থল আবিষ্কারের জন্য হন্যে হয়ে ছুটাছুটি শুরু করল। এই গুজব কোথা থেকে উদয় হয় জানা নেই কারো। গোয়েন্দারা অনেক ভেবে দেখল, নতুন সৈন্যদের অসাবধান কথাবার্তা থেকে এসব গুজব জন্ম নিতে পারে। আর পারে শত্রুদের সুপরিকল্পিত তৎপরতার মাধ্যমে। দুশমনদের এজেন্টরা কোথায় ঘাপটি মেরে আছে জানা নেই আমাদের। এই গুজবের উৎস খুঁজে বের করার জন্য অন্তত একজন এজেন্ট এখন হাতে পাওয়া দরকার।

আইয়ুবীর পক্ষ থেকে নতুন সৈন্য ভর্তি করার ঘোষণা প্রচার করা হলো। আশা করা গিয়েছিল, পরাজয়ের প্রতিশোধ

নিতে জেহাদের জযবা নিয়ে অনেকেই নতুন করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য ছুটে আসবে। কিন্তু দেখা গেল, জনতার মধ্যে জেহাদের সেই প্রেরণা নেই। সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য দলে দলে লোক ছুটে আসার পরিবর্তে জনতার মধ্যে বিরাজ করছে এক ধরনের অনাগ্রহ ও অনীহা। কিন্তু পরাজয়ের আগে মিশরের জনমনে এমন ভাব ছিল না।

আইয়ুবী বুঝলেন, জনগণের এ অনাগ্রহের পেছনে কাজ করছে গুজবের ঘুনপোকা। এই পোকা সবার অলক্ষ্যে সমাজদেহকে ভেতর থেকে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলছে। যদি অচিরেই এ পোকা নিধন করা না যায় তবে যে কোন সময় তাসের ঘরের মতই এ সমাজ তছনছ হয়ে যাবে।

গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে শিউরে উঠলেন। তিনি আবার তলব করলেন গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান ও পুলিশ প্রধান গিয়াস বিল্লকিসকে। তাদের সামনে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'যে কোন মূল্যে এই গুজবের তুফান ঠেকাও, নইলে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হবে না।'

চিন্তিত মনে কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন আলী বিন সুফিয়ান। তাঁর চৌকস গোয়েন্দা কমাণ্ডারদের ডেকে বললেন, 'শহর নয়, শহরের আশপাশের গ্রামগুলোতে তীক্ষ্ণ নজর ফেলো। এটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। কেউ বা কোন সংঘবদ্ধ চক্র এ গুজব ছড়াচ্ছে। কেন ছড়াচ্ছে তা আমরা জানি, কিন্তু কারা ছড়াচ্ছে তা জানি না। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। অবশ্যই

এই দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করতে হবে। আজ, এখন, এই মুহূর্ত থেকে এর হদিস না পাওয়া পর্যন্ত কারো ঘরে ফেরা হারাম। গ্রুপ হবে মাত্র দু'জনের। পালা করে চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি অব্যাহত রাখতে হবে। তোমরা গ্রুপ ঠিক করে নাও এবং এলাকা নির্দিষ্ট করে কাজে নেমে পড়ো।'

তিনি বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি, তোমরা যদি পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে কাজে লাগতে পারো নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। সুলতান বড় অস্থির অবস্থায় আছেন। তোমরা সফল হলেই কেবল তার অস্থিরতা কমতে পারে।'

এক কমাণ্ডার বললো, 'আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ্ সহায় হলে আগামী চব্বিশ ঘন্টার ভেতরই আমরা সুলতানের পেরেশানী দূর করার দাওয়াই নিয়ে আপনার কাছে হাজির হয়ে যাবো।'

চৌকস গোয়েন্দারা এবার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আলী শহর এবং শহরের আশপাশের গ্রামগুলোতে জালের মত বিছিয়ে দিলেন তার গোয়েন্দাদের। দিন চলে গেল, কিন্তু একজন গোয়েন্দাও নতুন কোন সংবাদ নিয়ে ছুটে এলো না তার কাছে। সুলতান আইয়ুবী এবং তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্ণাম ছড়ানোও বন্ধ হলো না।

সেই কালো দাড়িওয়ালা হুজুর, যে তার দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শহরতলীর এক গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন, বহাল তবিয়তেই তিনি তার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গ্রামবাসীরা তাকে একটি বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছে। তিনি সেই

বাড়ীতে বসে নিত্য-নতুন গুজব জন্ম দিচ্ছিলেন আর তার ভক্ত সৈনিকরা সেই গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছিল মুখ থেকে মুখে।

হুজুর খুব সতর্কতা অবলম্বন করে কাজ করছিলেন। জনসমক্ষে না এসে তিনি তার সব কথাই তুলে দিচ্ছিলেন তার একান্ত ভক্ত অনুরক্তদের কাছে। ভক্তদের তিনি বললেন, 'মিশরের পাপী সৈনিকদের পাপ মোচনের জন্য আমি তিন মাসের চিল্লা শুরু করেছি। এ সময় আমি একান্ত ভক্ত কয়েকজন ছাড়া আর কারো সাথে দেখা সাক্ষাত করবো না। তাতে আমার ধ্যানের ক্ষতি হবে।'

হুজুর এখন বাড়ী থেকে সামান্যই বের হন। কোন দর্শনার্থী এলেও তাদের সাথে কথা বলেন না। সারাক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকেন। নিরবে এবাদত বন্দেগী করেন আর কেউ ছালাম দিলে ইশারায় ছালামের উত্তর দিয়ে আবার মগ্ন হয়ে পড়েন ধ্যানে।

তার বিশেষ সঙ্গীদের মধ্যে সেই দু'জনও রয়েছে যারা রাস্তায় টিলার মাঝে তাকে সিজদা করেছিল। তারা এবং গ্রামের যেসব সৈন্যরা তার সাথে রমলা থেকে কায়রো ফিরেছিল সবাই হুজুরের সুখ্যাতি ছড়াতে লাগলো।

হুজুরের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা তার সাক্ষাৎ লাভের আশায় সেই বাড়ীতে এসে ভীড় জমাতে লাগলো। হুজুরের পরিবর্তে এইসব জনতাকে সামাল দেয়ার দায়িত্ব পালন করতো সেই দুই লোক।

সেদিনই সন্ধ্যায় আলী বিন সুফিয়ানের এক গোয়েন্দা তার ডিউটি চালাতে গিয়ে কায়রোর সন্নিকটে সেই গ্রামে

গিয়ে পৌঁছলো। গোয়েন্দাটি ছদ্মবেশে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে গ্রামের বড় মসজিদের কাছে চলে এলো।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। গোয়েন্দাটি মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে প্রবেশ করলো। নামাজ শেষে মুসল্লীদের নিয়ে ইমাম সাহেব দোয়া করলেন।

মোনাজাত শেষ হলে এক মুসল্লী রমলার পরাজয়ের প্রসঙ্গ তুলল। বলল, 'হুজুর আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। হুজুর ঠিকই বলেছেন, জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে। আইয়ুবীর ওপর নাখোশ হয়েছেন বলেই আল্লাহ এই জিল্লতি ও গজব চাপিয়ে দিয়েছেন আমাদের ওপর। কারণ আমাদের টাকা দিয়েই প্রতিপালিত হয় তার সেনাবাহিনী। আমরা টাকা দেই দ্বীনের তরক্কীর জন্য, আর সেই টাকায় প্রতিপালিত সেনাবাহিনী ময়দানে গিয়ে মেতে উঠে বর্বরতায়। ফলে তাদের পাপ তো আমাদেরকে স্পর্শ করবেই! আর পাপ করলে গজব যে নেমে আসে এ কথা কার না জানা?'

গোয়েন্দাটি মুসল্লীদের সাথে মিশে তার কথা শুনছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো, 'কোন্ হুজুরের কথা বলছেন?'

'কেন, আপনি জানেন না, আমাদের গ্রামের সৈন্যরা যখন রমলা থেকে ফেরার পথে মরতে বসেছিল তখন এক কামেল হুজুর তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে এসেছেন। তিনি গায়েবের খবর জানেন। জ্বীনের তার খাবার পৌঁছে দেয়।'

লোকটি কালো দাড়িওয়ালা হুজুর কি করে তাদেরকে বিরাণ মরুভূমি থেকে উদ্ধার করেছিল তার পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা

করে বললো, 'হুজুর যদি সেদিন গায়েবী শক্তির দ্বারা খাবার ও পানি সরবরাহ না করতেন, তবে মরুভূমিতেই আমাদের মৃত্যু হতো। তিনি না থাকলে আমরা কোনদিনই আর বাড়ী ফিরে আসতে পারতাম না।'

গোয়েন্দা লোকটি তো বটেই এমনকি উপস্থিত সকল মুসল্লী তার কথা প্রচণ্ড আগ্রহ ও বিস্ময় নিয়ে শুনলো। তার কথা যখন শেষ হলো তখন মুসল্লীরা তাকে ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো। কেউ বললো, 'তিনি কি মানুষের মনের আশা পুরণ করতে পারেন?'

অন্য একজন বললো, 'দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের কি তিনি আরোগ্য করতে পারেন?'

কেউ হয়তো বললো, 'তিনি কি সত্যি গায়েব জানেন? ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন?'

অন্য জন প্রশ্ন করে বসলো, 'তিনি কি বন্ধ্যা নারীকে সন্তান দিতে পারেন?'

লোকটি জবাবে বলছিল, 'তিনি সব পারেন, সব পারেন।'

গোয়েন্দা আবার প্রশ্ন করলো, 'আইয়ুবীর পরাজয় সম্পর্কে তিনি ঠিকই বলেছেন। কথায় বলে না, পাপ বাপকেও ছাড়ে না।'

লোকটি বললো, 'হুজুর বলেন, সুলতান আইয়ুবী ও তার সৈন্যদের মাঝে ফেরাউনী চাল চলন শুরু হয়ে গেছে। সে জন্য আল্লাহ তাদের ওপর নাখোশ হয়েছেন। আইয়ুবীর পরাজয়ের এটাই নাকি মূল কারণ। এখন যারা আইয়ুবীর পক্ষে যাবে তারা সবাই আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে পড়ে ধ্বংস

হয়ে যাবে। তাই আমি ঠিক করেছি, আমি নিজেও সেনা দলে থাকবো না এবং কাউকে সেনা দলে ভর্তিও হতে দেবো না।'

'আপনি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। অস্তমিত সূর্যের সংগী হওয়া উচিত নয় কারো। ডুবন্ত তরীতে কে থাকতে চায়? কেউ এখন সুলতানের সেনাদলে ভর্তি হলে সে তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। যার সামান্য বুদ্ধি আছে সে কেন এমনটি করবে?'

'তবে হুজুর বড়ই মেহেরবান। তিনি মিশরবাসীর পাপ মোচনের জন্য তিন মাসের চিল্লায় বসেছেন। হুজুরের চিল্লা এখনো শেষ হয়নি। চিল্লা শেষ হলে তিনি বলতে পারবেন আমাদের পাপ ক্ষমা হয়েছে কিনা?'

লোকটি মসজিদ থেকে বের হয়ে বাড়ীর দিকে হাঁটা দিল। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা লোকটিকে অনুসরণ করে পথে তাকে পাকড়াও করে বললো, 'ভাই, আমার একটু উপকার করবেন? আমি হুজুরের সাথে একটু দেখা করতে চাই, একটু ব্যবস্থা করে দেবেন?'

'হুজুরের সাথে দেখা করবেন? কিন্তু তিনি তো সারাক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকেন, কোন কথা বলেন না।'

'ভাই, আপনি জানেন না আমি কি বিপদে আছি।' সে তার অভিপ্রায় বর্ণনা করে বললো, 'আমি এখনও সেনাবাহিনীতে আছি। আপনার কথা শুনে আমার মনে খুব ভয় হচ্ছে। যে সৈন্যদলের পাপের কারণে এ গজব নেমে এসেছে সে শাস্তিতো আমাকেও ভোগ করতে হবে। আমিও হলবের রণাঙ্গনে গিয়েছিলাম। আমিও সে পাপ করেছি যে কথা আপনি বলেছেন। এখন আমার কি হবে? আমার তো

বাঁচার কোন উপায় নেই। আমার ওপর একটু রহম করুন। আমাকে সেই মহান হুজুরের কাছে নিয়ে চলুন, যিনি আপনাদেরকে মরুভূমিতে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন।'

লোকটি থমকে দাঁড়াল। আনিসের দিকে ফিরে বলল, 'বলো কি! তোমার মাথার ওপর তো তাহলে সাক্ষাত যম ঘুরাফেরা করছে!'

'হ্যাঁ, সে জন্যই তো আমি হুজুরের মদদ চাই। তিনি যদি বলেন, তাহলে আমি সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যাবো। আমার পাপের কাফফারা হিসাবে তিনি যা করতে বলবেন, আমি তাই করবো। যদি তিনি আমাকে প্রাণে বাঁচাতে পারেন এবং পঙ্গুত্বের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন তবে আমি সারা জীবন তার খেদমতে নিজেকে বিলিয়ে দেবো। আল্লাহর গজবের কথা শুনে আমার অন্তরে এমন ভয় ঢুকে গেছে যে, এখন আমি আর কিছুই চিন্তা করতে পারছি না। আপনি আমাকে বাঁচান, আমাকে হুজুরের কাছে নিয়ে চলুন।'

তার কণ্ঠ থেকে করুণ অনুনয় বেরিয়ে এলো, চোখ দিয়ে বেরিয়ে এলো অশ্রুর ধারা।

গোয়েন্দাটির কণ্ঠের করুণ আকুতি দেখে লোকটির মায়া হলো। বললো, 'ঠিক আছে, তুমি আমার সাথে চলো। কিন্তু একটা কথা, কাউকে বলবে না যে তুমি তাঁর সাথে দেখা করেছো। কারণ তিনি এখন চিল্লাতে আছেন। চিল্লায় থাকা অবস্থায় সাধারণত তিনি কারো সাথে কথা বলেন না। তবে জরুরী কিছু হলে ভিন্ন কথা।'

'তিনি আমার জন্য দোয়া করবেন কিনা এটা কেমন করে বুঝবো?'

'তোমাকে দেখে যদি তাঁর দয়া হয় তবে নিজে থেকেই তিনি তোমার সাথে কথা বলবেন। তিনি যা জিজ্ঞেস করবেন শুধু তারাই উত্তর দেবে। আজেবাজে কিছু জিজ্ঞেস করে তাঁকে বিরক্ত করবে না।'

'না, বিশ্বাস করুন, তিনি রাগ করতে পারেন এমন কিছুই আমি করবো না। শুধু ভয় পাচ্ছি, আমি তো পাপী মানুষ, তিনি না আবার আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেন!'

'আরে না, তুমি জানো না, তিনি কেমন রহমদীল মানুষ। তাঁর মহত্ব আর মোজেযা দেখেছি আমরা যারা রমলার রণাঙ্গন থেকে তার সাথে একত্রে ফিরে এসেছি। আমাদের বাঁচার কোন আশাই ছিল না। আমরা সবাই ছিলাম পাপী। কিন্তু তিনি আমাদের ঘৃণা না করে যেভাবে আমাদের বুকে টেনে নিয়েছিলেন, সেটা কেবল তাঁর মত মহৎ লোকের পক্ষেই সম্ভব। তুমি পাপী বলেই তো তিনি তোমাকে আশ্রয় দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বেশী করে উপলব্ধি করবেন।'

'আপনি তো এই গ্রামেরই বাসিন্দা? তাছাড়া আপনি তাঁর সাথে কঠিন সময়ে সফর করে বেরিয়েছেন। ফলে হুজুরকে আপনি যত গভীরভাবে জানেন সবার পক্ষে কি হুজুরকে সেভাবে চেনা সম্ভব? হুজুরের যত কেরামতি তার খবর আপনার চাইতে আর কে বেশী জানবে!'

'এ জন্যই তো আমি কোরআন স্পর্শ করে বলতে পারি, এই হুজুর আল্লাহর অতি প্রিয় সঙ্গীদের একজন।' লোকটি

আরো বললো, 'আমি যুদ্ধক্ষেত্রের অভিশাপ দেখেছি, হয়তো অনেকেই আমার মত তা দেখেছে। কিন্তু এই হুজুর যেভাবে মরুভূমিকে শস্যক্ষেত বানিয়ে দেখিয়েছেন, আমি হলপ করে বলতে পারি, তেমনটি আর কেউ দেখেনি। সে জন্যই তো আমি আর সেনাবাহিনীতে ফিরে না গিয়ে এই হুজুরের খেদমতে জীবন পার করে দেয়ার মনস্থ করেছি।'

মসজিদ থেকে গ্রাম বেশী দূরে ছিল না। তারা কথা বলতে বলতে গ্রামে পৌঁছে গেল। ততক্ষণে গ্রাম জুড়ে নেমে এসেছে রাতের অন্ধকার।

একটি বাড়ীর দরজায় গিয়ে লোকটি আনিসকে বলল, 'তুমি এখানেই দাঁড়াও। আমি ভেতরে গিয়ে দেখি হুজুর কি অবস্থায় আছেন। তাঁর অনুমতি পেলেই আমি এসে তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাবো।'

বাইরে রাতের আঁধারে দাঁড়িয়ে রইলো আনিস। সঙ্গের লোকটি বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। হুজুরের সাথে লোকটির কি কথা হলো শুনতে পেলো না আনিস। সে চুপচাপ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পর ফিরে এলো লোকটি। তাকে বললো, 'তোমার ভাগ্য ভাল, হুজুর তোমার সাথে কথা বলতে সম্মত হয়েছেন।' তারপর বললো, 'এদিক দিয়ে এসো।'

লোকটি নিজে আগে আগে চললো আর তাকে অনুসরণ করলো গোয়েন্দা আনিস। একটু পর দু'জনেই উঠান ও বারান্দা পার হয়ে এক কামরার মধ্যে প্রবেশ করলো।

বারান্দায় আলো জ্বলছিল। হুজুরের কন্যা পরিচয়ে যে মেয়ে দু'টি তার সঙ্গে এসেছিল তারা ছিল অন্য কামরায়। হুজুরের কামরায় যাওয়ার জন্য উঠান পেরিয়ে ওরা বারান্দায় উঠে এলো। তাদের পায়ের ধ্বনি শুনতে পেয়ে মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখতে গেলো কে আসছে, আর তখনি একটা মেয়ে তাদের দেখে এমনভাবে চমকে উঠলো যে, তার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো বিস্ময়সূচক ধ্বনি, 'হ্! হায়!'

অন্য মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হলো? এ লোক কে?'

'মনে হয় আমার ধাঁধাঁ লেগেছে।' মেয়েটি উত্তরে বললো, 'আমি এই লোককে কোথায় যেন দেখেছি।' এই বলে সে গভীর চিন্তায় পড়ে গেল।

গোয়েন্দা কামরায় ঢুকে কালো দাড়িওয়ালা হুজুরের সামনে সিজদায় পড়ে গেল এবং তাঁর পায়ের উপর কপাল ঠেকিয়ে ওভাবেই পড়ে রইলো।

হুজুর বিছানায়- মখমলের চাদরের ওপর বসেছিলেন। আনিস হুজুরের পায়ের ওপর মাথা রেখে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার চোখের পানির স্পর্শ পেলেন হুজুর। তিনি আস্তে তার একটি হাত আনিসর মাথার ওপর দিয়ে স্নেহের কণ্ঠে বললেন, 'ভয় পাসনে। আল্লাহ তওবাকারীকে খুবই পছন্দ করেন। উঠ্, বল তোর কি সমস্যা।'

গোয়েন্দা হুজুরের পায়ের ওপর থেকে মাথা তুলে গদগদ কণ্ঠে বললো, 'হুজুর, আমি পাপী। আল্লাহর গজব আমাকে ঘিরে ফেলেছে। আমাকে বাঁচান।' তার কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

গোয়েন্দা নিজেকে সেনাবাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমরা জঘন্য পাপে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সেই পাপের শাস্তি দেয়া শুরু হয়ে গেছে। আপনার দোয়া ছাড়া এই পাপের শাস্তি থেকে কেউ রেহাই পাবে না। একমাত্র আপনিই পারেন শাস্তির হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে, যেমন মরুভূমিতে আপনি দয়া করে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন এই গ্রামের পাপী সৈনিকদের। আপনি যদি আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচান, সারা জীবন আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকবো। আল্লাহরওয়াস্তে আমার ওপর রহম করুন। আমাকে মুক্ত করুন আমার পাপ থেকে।' তার চোখে অশ্রু টলমল করছিল।

আনিসের কথা আর কণ্ঠের কাকুতি শুনে হুজুর হাতের তসবিহ তার মাথার ওপর রেখে হেসে উঠে বললেন, 'যুবক, প্রায়শ্চিত্য না করলে যে তোমার পাপ মোচন হবে না।'

'আপনি আমাকে যা খুশী শাস্তি দিন।' আনিস চোখের অশ্রু ছেড়ে দিয়ে বললো, 'আপনি আমাকে আদেশ করুন যাতে আমি আপনার আদেশ পালন করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে পারি। আমার একটি মাত্র সন্তান আছে, আপনি হুকুম দিলে আমি তাকে আপনার পদতলে সোপর্দ করবো। আপনি আদেশ দিলে আমি সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করার জন্য ছুটে যেতেও দ্বিধা করবো না। আমাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন জানতে পারলে আমি আপনার যে কোন আদেশ ও শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। আপনার আদেশ পালনে আমি কখনোই কোন অবহেলা করবো না।

আপনি কিছু বলুন! কিছু আদেশ করুন! দেখুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি।'

গোয়েন্দা যখন কথা শুরু করেছিল, সে সময় এক লোক কামরায় প্রবেশ করে দেখলো আনিস হুজুরের পা ধরে বসে আছে। আনিসর কথা শুনে সে লোক বললো, 'তুমি এত উতলা হচ্ছো কেন? এখন তো তুমি মুরশিদের ছায়ায় বসে আছো।'

'আমার পাপ এত বেশী যে, পাপের চিন্তায় রাতে ঘুমাতেও পারি না।' আনিস বললো, 'আমি হিম্মতের কাছে এক গ্রামের এক মুসলিম পরিবারের সুন্দরী এক মেয়েকে কিডন্যাপ করতে গিয়ে তার ছোট ভাইকে হত্যা করে ফেলি। যদি আমি সেনাবাহিনীর লোক না হতাম তবে গ্রামের লোকেরা আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। কিন্তু আমার হাতে অস্ত্র আর পরণে সেনাবাহিনীর পোশাক থাকায় আমাকে কেউ কিছু বলার সাহসও পায়নি।'

তার কথা শুনে হুজুর চোখ বন্ধ করে ফেললেন। আনিস তাকিয়ে দেখলো হুজুরের ঠোঁট নড়ছে। সহসা তিনি তার হাত দু'টি উপরে তুলে গুম মেরে বসে রইলেন।

একটু পর তিনি হাত নামিয়ে চোখ খুললেন। গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন আনিসের দিকে। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হেসে বললেন, 'অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তুমি আমার কাছে এসেছো। এবার আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। আমি তোমার গোনাহখাতা মাফ করিয়ে দেবো, তবে এখন নয়। তুমি আগামী কাল আবার

এখানে আসবে। কিন্তু তুমি যে এখানে এসেছো এ ব্যাপারে কারো সাথে কোন আলোচনা করবে না। যদি তেমন কিছু করো তবে তুমি তো ধ্বংস হবেই, সেই সাথে তোমার বংশও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

হুজুর আরো বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় এই লোকের সাথে গ্রামের বাইরে মসজিদের ওখানে দেখা করবে। সে তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তোমার কপালে স্পষ্ট লেখা আছে, তোমার পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যাবে এবং তোমার ও তোমার বংশের সবার উপার্জন ও রুজি এত বেড়ে যাবে, যা তুমি স্বপ্নেও কল্পনা করোনি। এখন তুমি চলে যাও, কাল আসলে আমি তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবো।'

কথা শেষ করে হুজুর আবার মুরাকাবাতে চলে গেলেন। রমলা থেকে ফিরে আসা সৈনিক ও অন্য লোকটি আনিসকে নিয়ে বাইরে এলো। তাকে উঠানে দাঁড় করিয়ে অনেকক্ষণ হুজুরের মহিমা ও মোজেজার কথা বলে তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল।

এই ফাঁকে মেয়ে দু'টি জানালার পাল্লার আড়াল থেকে তাকে আবারো দেখলো। যে মেয়েটি প্রথম তাকে দেখে আৎকে উঠেছিল সে তার সঙ্গী মেয়েটিকে আবারো বললো, 'একে আমি আগেও কোথাও দেখেছি। এটা আমার দৃষ্টিভ্রম নয়, এই সে ব্যক্তি, যার ছবি আমার বুকে এখনো খোদাই করা আছে। কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না।'

'ব্যাপারটা ঠিক সেই আগের ঘটনার মতই মনে হচ্ছে, যে কেসটা আমরা পূর্বেও ধরেছিলাম।' গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান আনিসের কাহিনী শুনে বললেন, 'ঠিক সেই মুরাকাবা, সেই চিল্লা ও জ্বীন বশীভূত করে লোকদের মনে ভয় ও ভক্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা, মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তাদের তাবেদার বানানোর খেলা।'

গোয়েন্দা বলল, 'সে মসজিদের মুসল্লীদের জড়ো করে সৈন্যদের বিরুদ্ধে এমন সব উস্কানীমূলক কথা বলছিল, যা শুনলে যে কেউ বুঝবে, এ লোক পরিকল্পিতভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।'

'এতেই প্রমাণ হয়ে গেছে, সে একা নয়। তার সাথে আরও অনেকেই আছে, যারা মসজিদে গিয়ে তার মতই মুসল্লীদেরকে সৈন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। এটা একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। নাটের গুরু ওই হুজুর। আর তার শাগরেদ হয়ে এ কাজ করছে দুশমন গোয়েন্দারা। আর এদের টোপ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যুদ্ধ ফেরত মুর্খ কিছু সৈনিক ও হুজুরের অন্ধ ভক্তকুল। যারা আবেগ তাড়িত এবং হয়তো অনেকেই জানেও না তারা কি করছে।'

'যারা যুদ্ধক্ষেত্রের মিথ্যা বর্ণনা শুনাচ্ছে আর কেউ যেন সেনাবাহিনীতে ভর্তি না হয় সে জন্য মিথ্যা প্রোপ্রাগাণ্ডা চালাচ্ছে তাদেরকে এ কথা বলে আপনি তাদের পাপ কমাতে পারবেন না।'

'আমি তাদের পাপ কমানো বা বাড়ানোর কথা বলছি না। আমি তাদের বুদ্ধির তারিফ করছি।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'মসজিদে মানুষ যে কথা শোনে তাকেই তারা অহীর মত বিশ্বাস করে। মানুষ আবেগের দাস। মানুষ তাকেই মুরশিদ মান্য করে যে তার আবেগের উপর প্রথমে পা রাখতে পারে। ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য তারা ইসলামী লেবাসকেই বেছে নিয়েছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিধর্মীরা মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতৃত্বও অবলীলায় কাঁধে তুলে নিয়েছে।

আর আমাদের আলেমরা? আমাদের আলেমরা রাজনীতি থেকে দূরে সরে নিজেদের ঈমান বাঁচানোর চেষ্টা করছে। যে আলেমদের দায়িত্ব মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দিকনির্দেশনা দিয়ে সত্য সঠিক পথে পরিচালিত করা, সেই আলেম সমাজই এখন বিভ্রান্ত। দুশমনের প্ররোচনায় পড়ে ইসলামের অবিভাজ্য সত্ত্বাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেও ভাবছে, তারা সত্য-সঠিক পথে আছে। তারা দ্বীন ও দুনিয়াকে আলাদা করে ইসলামের একক সত্ত্বাকেই দু'টুকরো করে ফেলেছে। তাদেরকে কে বুঝাবে, দুনিয়ার জন্যই দ্বীন এসেছে। দুনিয়ার জীবন মানুষ কিভাবে চালাবে দ্বীনের বিধানে শুধু তাই বলা আছে। পরকালে কিভাবে চলতে হবে সে কথা দ্বীনের বিধি-বিধানে নেই, কেননা, পরকালে স্বাধীনভাবে চলার কোন অধিকার মানুষের থাকবে না।'

আলী বিন সুফিয়ানের হঠাৎ সম্বিত ফিরে এলো। তিনি তত্ত্বকথার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন। আনিসের দিকে

ফিরে বললেন, 'থাক এসব কথা, এবার কাজের কথায় আসি। তুমি কাল সময় মত আবার সেখানে যাও। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। যেভাবে অভিনয় করছো সেভাবেই অভিনয় চালিয়ে যাও। তাদের আরো গভীরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করো। যত বেশী সম্ভব তথ্য ও নিদর্শন জোগাড় করো। তোমার সংগৃহীত তথ্য ও নিদর্শনই আমার অভিযানের পথ খোলাসা করে দেবে। আর তার আগে তুমি আমাকে সেই বাড়ী ও গ্রাম চিনিয়ে দাও, যাতে আমি প্রয়োজনে সেখানে কমান্ডো অভিযান চালাতে পারি।'

'আমার ভয় হয়, কমান্ডো অভিযান চালালে যদি জনগণ ক্ষেপে যায়?' আনিস বললো, 'রমলার সেই সৈনিক বলেছে, গ্রামের শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই তার মুরিদ হয়ে গেছে। এমনকি দূরদূরান্ত থেকেও লোকেরা তার দর্শন লাভের জন্য আসে।'

'জনগণকে আমিও ক্ষ্যাপাতে চাই না। কিন্তু প্রয়োজনে কিছু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। আমাদের এ কথা চিন্তা করলে চলবে না, লোকেরা কি বলবে। বরং আমাদের চিন্তা করতে হবে, লোকদের দিয়ে কি বলাতে হবে।'

আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'জনগণের আবেগ ও চেতনার মূল্য অবশ্যই দিতে হবে। তবে জনগণের সাথে কখনোই আমরা সেই আচরণ করতে চাই না, যেমনটি করে কোন ক্ষমতালোভী সরকার। ক্ষমতার স্বার্থে গণ আবেগকে নিজেদের পক্ষে রাখার জন্য সত্যকে তারা মিথ্যা বলতে পারে, আবার মিথ্যাকেও সত্য বলে চালিয়ে দিতে পারে। এমনটি

শুধু সেই সরকারই করতে পারে, শাসন ক্ষমতাই যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু মনে রেখো, আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এ জন্য তিক্ত সত্যকেও দরকার হলে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে আমাদের। জনগণের ভয়ে নয়, আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আল্লাহর ভয়কে সামনে রেখে। জনগণকে খুশী রাখতে গিয়ে এমন কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, যাতে আল্লাহ নাখোশ হন।'

গোয়েন্দা বললো, 'আপনার নসিহত আমার মনে থাকবে।'

'আমাদেরকে যে কথাটি সব সময় মনে রাখতে হবে, তা হলো, ইসলামী রাষ্ট্র ও কোরআনী শাসনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব চেপে আছে আমাদের কাঁধে। আমরা জনগণকে বাস্তবতা বুঝাতে চাই, সত্যের পথে পরিচালিত করতে চাই। কিন্তু আমরা কখনোই তাদেরকে সুলতান আইয়ুবীর মুরীদ বা গোলাম বানাতে চাই না।

আমাদের কাছে মানুষ হিসাবে সুলতান আইয়ুবী যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ দেশের অন্য যে কোন জনগণ। আমরা তার হাতকেই শক্তিশালী করতে চাই যিনি ইসলামের অনুসারী ও খাদেম। তেমনি আমাদের কাজ ইসলামের শত্রুদের চিহ্নিত করা এবং তাদের প্রতিহত করা।

আমরা জাতির বুকে হাত বুলিয়ে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাই না, আমরা জাতিকে বাস্তবতার ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিতে চাই। তুমি গিয়ে সেই সূত্র অন্বেষণ করো যা তুমি

দেখোনি। আমার বিশ্বাস, তুমি এমন কোন নিদর্শন পেয়ে যাবে, যা জনসমক্ষে তুলে ধরলে এসব ভণ্ড হুজুরদের বিরুদ্ধে তোমাকে কিছুই করতে হবে না, বরং ইসলামের প্রতি সামান্য মোহাব্বত পোষণকারী যে কোন ব্যক্তি তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্য জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যার পর গোয়েন্দাটির সেখানে পৌঁছার কথা। দুপুরে আলী বিন সুফিয়ান তার পোষাক পরিবর্তন করে সেই গ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। তাকে দূর থেকে পথ দেখিয়ে চললো সেই গোয়েন্দা।

বাড়ীটার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন তারা। ইশারায় বাড়ীটি দেখিয়ে দিল আনিস। আলী বিন সুফিয়ান বাড়ীটির অবস্থান ও চৌহদ্দি ভাল করে মনের ভেতর গেঁথে নিলেন। চারদিকটা ঘুরেফিরে দেখার জন্য আপন মনে পা চালালেন।

বাড়ীর আশপাশের লোকালয়, দোকানপাট দেখলেন। টের পেলেন বাড়ীতে যারা আসা যাওয়া করছে তাদের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে।

তিনি রাস্তার ধারের এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লোকজনের কথাবার্তা শোনলেন। তাদের কথাবার্তা শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। এখানেও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জনমনে ঝড় তোলার জন্য নানা রকম কুৎসা রটনা করা হচ্ছে একই কায়দায়।

আলী বিন সুফিয়ান দূর থেকে বাড়ীর পিছন দিকটা লক্ষ্য করলেন। বাড়ীর পিছন দিকে ছোট একটা খিড়কি দরজা।

দরজাটা বন্ধ। এ পর্যন্ত একবারও কাউকে খুলতে দেখা যায়নি। দরজার পাশেই একটা গাছ। গাছটা বাড়ীর দেয়াল ছাড়িয়ে আকাশের দিকে উঠে গেছে।

বাড়ীটির ডানে এবং বামেও দু'টি বাড়ীর পিছন আঙ্গিনা। সেদিকে কোন মানুষজন নেই। মানুষের ভীড় সামনের দিকে।

তখনো তাঁর দৃষ্টি বাড়ীটির পিছন দরজা ও তার আশপাশের এলাকাতেই ছিল। হঠাৎ তাঁকে অবাক করে দিয়ে বাড়ীটির পেছন দরজা খুলে গেলো। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, সাদা দাড়িওয়ালা এক লোক ময়লা একটা পুরনো জোব্বা পরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

চকিতে আলী বিন সুফিয়ানের দৃষ্টি গিয়ে আছড়ে পড়লো খোলা দরোজার ভেতরে। সেখানে এক সুন্দরী যুবতী দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি বেরিয়ে যেতেই মেয়েটি চটজলদি দরজা বন্ধ করে দিল।

সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লাঠি ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে পথ চলে গ্রাম থেকে বের হয়ে গেল। আলী বিন সুফিয়ান লোকটির পিছু নিলেন।

গ্রামের বসতি এলাকার বাইরে এসে বুড়ো এক গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেল। তারপর অনুসন্ধানী চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো।

একটু পর একদিক থেকে এক অশ্বারোহী এসে সেই গাছের ছায়ায় থামলো এবং ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ঘোড়াটি তুলে দিল বৃদ্ধের হাতে। সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ সেই ঘোড়ায় চড়ে কায়রোর দিকে রওনা হয়ে গেল।

যে লোক ঘোড়া এনেছিল সে এবার হাঁটা ধরলো এবং হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেল।

আলী বিন সুফিয়ান দূর থেকেই বৃদ্ধকে অনুসরণ করছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলেন। লোকটি গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেলে আলী বিন সুফিয়ান ছুটলেন তার ঘোড়ার কাছে। তিনি ঘোড়ার কাছে পৌঁছেই লাফিয়ে চড়ে বসলেন ঘোড়ায়। সাদা দাড়িওয়ালাকে অনুসরণ করার জন্য নিজেও ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ধরলেন কায়রোর দিকে।

আলীর বুঝতে বাকী রইলো না, এই বৃদ্ধ এক ঝানু গোয়েন্দা। লোকটি বৃদ্ধ নয়, কিন্তু বুড়োদের আচরণ সে নিখুঁতভাবেই করে দেখিয়েছে। গোয়েন্দাবৃত্তির সব ধরনের ট্রেনিংই আছে লোকটির। অতএব সতর্কতার সাথেই তাকে অনুসরণ করা দরকার।

আলী বিন সুফিয়ান নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পথ চলছেন। তার চালচলনে কোন অস্থিরতা বা তাড়াহুড়ো নেই।

সেই সাদা দাড়িওয়ালা কয়েকবার পিছনে তাকালো। দু'একবার থেমেও গভীরভাবে পেছনে লক্ষ্য করে দেখলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। কি বুঝলো সেই জানে, আবার চলতে শুরু করলো।

আলী বিন সুফিয়ান তাকে অনুসরণ করা অব্যাহত রাখলেন।

কায়রো এখান থেকে আর বেশী দূরে নেই। দূর থেকে দেখা যায় শহরের প্রাসাদের চূড়া। হঠাৎ সাদা দাড়িওয়ালা কায়রোর রাস্তা ছেড়ে ডান দিকের অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তায়

নেমে গেল। ঘোড়ার গতি স্বাভাবিক। তার চালচলনেও কোন অস্বাভাবিকতা নেই।

এটা কি পেছনের অশ্বারোহী তাকে অনুসরণ করছে কিনা দেখার জন্য, নাকি এটাই তার গন্তব্য পথ বুঝতে পারলেন না আলী বিন সুফিয়ান। তিনি একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন। যদি তাকে পরীক্ষা করার জন্য লোকটি রাস্তা ছেড়ে থাকে তবে তার পিছু নিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আবার পিছু না নিলে লোকটিকে হারাতে হবে। কি করবেন খানিক ভাবলেন তিনি, শেষে নিজেও অশ্বের গতি ও মুখ বৃদ্ধের ফেলে যাওয়া পথে ঘুরিয়ে ধরলেন।

কায়রো শহর দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু সেদিকে গতি ছিল না ওদের কারো। ওরা যে পথে এগুচ্ছিল তার দু'পাশে এদিক ওদিক একটি দুটি কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে। কোথাও যাযাবরদের অস্থায়ী তাবু।

সাদা দাড়িওয়ালা একাধিকবার রাস্তা পরিবর্তন করলো। বার বার পিছন ফিরে দেখলো আলী বিন সুফিয়ানকে। আলী বিন সুফিয়ানের লুকোবার কোন পথ ছিল না, বাধ্য হয়ে তিনি লোকটির পিছনেই লেগে রইলেন।

সাদা দাড়িওয়ালার মধ্যে অস্থিরতা জন্ম নিল। সেই অস্থিরতা প্রকাশ পেতে লাগলো তার তৎপরতায়। অনেক হিসেব করে দেখলো, যত দ্রুতই ঘোড়া ছুটানো হোক না কেন, অনুসরণকারীকে কিছুতেই খসানো যাবে না।

শেষে লোকটি তার চলার গতি আবার কায়রোর দিকে ফিরালো এবং গতি বাড়িয়ে দ্রুত ছুটতে শুরু করলো। আলী

বিন সুফিয়ানও ঘোড়ার লাগামে ঝটকা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল ঘোড়ার গতি। দ্রুত ঘোড়া দু'টি দিক পরিবর্তন করে কায়রোর দিকে ছুটতে লাগলো।

আলী বিন সুফিয়ান লোকটিকে ধরার জন্য প্রচণ্ড জোরে চাবুক কষলেন ঘোড়ার পিঠে। ক্রমে উভয়ের মাঝখানের দূরত্ব কমে আসতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে তারা শহরের একদম কাছে এসে গেল। আরেকটু পরেই সাদা দাড়িওয়ালা শহরে প্রবেশ করবে।

ওদের মাঝে তখন দূরত্ব মাত্র পনেরো বিশ গজ। সাদা দাড়িওয়ালা লোকটি শহরে ঢুকার আগ মুহূর্তে ঘোড়া থামিয়ে মোকাবেলার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

আলী বিন সুফিয়ানের পথ রোধ করে ধরতেই তিনিও দ্রুত তার অশ্বের লাগাম টেনে ধরলেন।

'তোমাকে কোন ডাকাত বলে মনে হচ্ছে।' সাদা দাড়িওয়ালা এই বলে খঞ্জর বের করলো আর বললো, 'তুমি ভুল ঠিকানায় পা দিয়েছো। আমার কাছে তেমন মূল্যবান কিছু নেই। আমার পিছনে কেন লেগেছো?'

আলী বিন সুফিয়ান বুড়োকে কাছ থেকে দেখলেন। দাড়ি দেখে মনে হয় লোকটি সত্তর আশি বছরের হবে। কিন্তু তার চেহারা, চোখ ও দাঁত বলছে, এ লোকের বয়স ত্রিশ, চল্লিশ বছরের বেশী নয়।

আলী বিন সুফিয়ানও তখন ছদ্মবেশে। গিয়েছিলেন এক শিষ্যের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে দুশমন গোয়েন্দাদের একটি

ঘাঁটির প্রকৃত অবস্থা জানতে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েই গিয়েছিলেন তিনি।

লোকটিকে রুখে দাঁড়াতে দেখে নিজের কোমরবন্দ থেকে সোয়া গজ লম্বা তলোয়ারটা টেনে বের করে নিলেন। তলোয়ারটা তার জোব্বার মধ্যে লুকানো ছিল। চোখের পলকে তলোয়ার বের করে বললেন, 'তোমার দাড়িটা ফেলে দাও।' আলী বিন সুফিয়ান তার চোয়ালের পাশে তলোয়ারের মাথা ঠেকিয়ে বললেন, 'আর আমার আগে আগে চলতে থাকো।'

সাদা দাড়িওয়ালার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। আলী বিন সুফিয়ান তলোয়ারের মাথা তার দাড়ির পাশে ঠেকিয়ে একটু টান দিতেই তার দাড়ি মুখ থেকে খসে পড়ল। নিজের পরিচয় লুকানোর চেষ্টা বৃথা দেখে লোকটি মাথা নত করলো।

আলী বিন সুফিয়ান তাঁর মুখে বিস্ময় ও বিষণ্নতা দেখে বললেন, 'আমরা দু'জনেই একে অপরকে ভালমত চিনি। ভনিতা না করে চলো এখন যাওয়া যাক।'

লোকটি শহরের খুব প্রভাবশালী ও উচ্চতর প্রশাসনিক অফিসার ছিল না বটে কিন্তু সে একেবারে অপরিচিত বা নিম্ন শ্রেণীরও কেউ ছিল না। সে মিশরেরই নাগরিক এবং মিশর সরকারের এক মধ্যমগোত্রের অফিসার ছিল।

তার সম্পর্কে আলী বিন সুফিয়ানের কাছে এ খবর আগেই পৌঁছে ছিল যে, তার গতিবিধি সন্দেহজনক। সম্ভবত সে দুশমনের গোপন চর। কিন্তু প্রমাণ না থাকায় এতদিন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যায়নি।

সে খেলাফতের রাজধানী কায়রোতে দীর্ঘদিন যাবত সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত আছে। সুলতান আইয়ুবী ক্ষমতায় আরোহণের সাত আট বছর আগেই সে চাকরীতে যোগদান করে। খলিফা আল আজিদ যখন ফেদাইন দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রুসেড ও সুদানীদের সঙ্গে জোট গঠন করেছিল তখনই মূলত এ লোক তাদের সঙ্গে হাত মিলায়। এরপর থেকে এতটা বৎসর প্রশাসনের ভিতরে ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে সে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে অপৎপরতায় লিপ্ত ছিল।

সুলতান আইয়ুবী নুরুদ্দিন জঙ্গীর সাথে পরামর্শ করে খেলাফতের অনেক দুশমনকে অপসারণ করেছিলেন। কিন্তু আব্বাসীয় খেলাফতের অনুসারী এই ধুরন্ধর ব্যক্তিটি নিজের পরিচয় গোপন করে কিভাবে এতদিন টিকেছিল, ভেবে অবাক হলেন আলী বিন সুফিয়ান। আরো অবাক হলেন, এতকাল পরও লোকটি গোপন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে লিপ্ত আছে দেখে।

রমলার পরাজয় এইসব দেশদ্রোহীদের জন্য এক সোনালী সুযোগ বয়ে নিয়ে এলো। সুলতান আইয়ুবী ও তার বাহিনীকে পাপিষ্ঠ, বিলাসপরায়ণ ও লুটেরা প্রমাণ করতে পারলে দীর্ঘদিন তারা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না ভেবে আববাসীয় খেলাফতের পরাজিত বাহিনী গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল। লোকটি ছিল সেই গোপন তৎপরতার ধুরন্ধর নায়ক।

আলী বিন সুফিয়ান লোকটাকে বন্দী করে সেই গোপন কারাগারে নিক্ষেপ করলেন, যেখানে রাষ্ট্রদ্রোহীদের জন্য বরাদ্দ থাকে সুকঠিন শাস্তি।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা রাতের আঁধারে গ্রামের বাইরে হুজুরের বলা সেই মসজিদের সামনে ঠিক সময়েই গিয়ে উপস্থিত হলো। গত রাতের সেই সৈনিক সেখানে তার জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। সে ওখানে পৌঁছতেই সৈনিকটি তার কাছে এসে আগ্রহ ভরে বলল, 'এসে গেছো তাহলে? তোমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি। চলো, এখানে আর দেরী করার দরকার নেই।'

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা গত রাতে দেখা সৈনিকটির নির্দেশ মত চলতে শুরু করলো। গ্রামে এসে সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে ওরা পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করল।

বাড়ীতে ঢুকে লোকটি গতকাল তাকে যে কামরায় নিয়ে গিয়েছিল সেখানে না নিয়ে অন্য এক কামরার দিকে পা বাড়াল। আনিস বলল, 'ওদিকে কোথায়, হুজুর এ কামরায় বসেন না?'

লোকটি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আস্তে! তোমাকে ঠিক জায়গাতেই নিয়ে যাচ্ছি। ভয় নেই, এখানে আমরা হুজুরের নির্দেশ ছাড়া কিছুই করি না।'

সে গত রাতের কামরায় যাওয়ার পরিবর্তে লোকটির সাথে অন্য আরেক কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলো। এ কামরায় সে অলৌকিক ক্ষমতাধর হুজুরকে কোথাও দেখতে পেল না।

সে কামরার চারদিকে চোখ বুলালো। কামরায় কোন আসবাবপত্র নেই। না কোন চেয়ার-টেবিল, না কোন খাট। এমনকি কামরায় কোন চাটাই বা চাদরও নেই।

গোয়েন্দার সব কটা ইন্দ্রিয় ততক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছে।

চট করে সে চাইল দরজার দিকে। ততক্ষণে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সে তাকিয়ে দেখলো, তাকে নিয়ে আসা সৈনিকটি কামরার বাইরে চলে গেছে। ঘুরে দ্রুত দু'পা এগিয়ে দরজায় হাত লাগালো, দেখলো দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

সে বুঝতে পারলো, তার অভিনয় সব বৃথা গেছে, তাকে তারা চিনে ফেলেছে। মুহূর্তে শত্রুর হাতে ধরা পড়ার চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। বুঝতে পারলো, এখন পালাবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। সে সেই ঘরে বসে কি করা যায় একা একা চিন্তা করতে লাগলো।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হলো। অন্ধকার কামরার মেঝেতে বসে আছে আনিস। কায়রোর মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, কিন্তু তার চোখে কোন ঘুম নেই। সে খতিয়ে দেখছিল, কোথায় সে বোকামী করেছে, কেমন করে তার গোপন পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেল? কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না কোথায় সে ভুল করেছে।

নিজেকে বড় অযোগ্য ও অপদার্থ মনে হচ্ছিল। এর মধ্যেই সে কামরার চারদিক খুঁজে দেখেছে, পালাবার কোন পথ বা ফাঁকফোঁকড় আছে কিনা? কিন্তু না, হতাশ হতে হলো তাকে।

মধ্য রাত। অন্ধকারে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে আনিস। হঠাৎ তার মনে হলো, কেউ একজন দরজা খোলার চেষ্টা করছে। উৎকর্ণ হলো সে, কে খুলতে পারে দরজা! যদি শত্রুই খুলবে তবে এত সতর্কতার দরকার কি? আর মিত্রই বা আসবে কোত্থেকে? মিত্রদের কেউ তো এখনো জানেই না, সে এখানে বন্দী হয়ে আছে। এক অনিশ্চিত শংকা নিয়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল আনিস।

আনিস দরজার দিকে পা বাড়াতে যাবে এ সময় খট করে খুলে গেল দরজা। সে দরজার দিকে তাকিয়ে যা দেখলো তা ছিল অবিশ্বাস্য, এক অনিন্দ্যসুন্দর মেয়ে দরজা আলো করে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে প্রদীপ।

এ ছিল সেই দুই মেয়ের একজন, যারা হুজুরের কন্যা পরিচয়ে রমলা থেকে এসেছে। মেয়েটির পরণে এখন আর বোরখা ছিল না, তবে ইউরোপীয় মেয়েদের মত উলংগও ছিল না। তার পরণে ছিল মুসলমান মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী আরবী পোষাক।

মেয়েটি কামরার ভিতরে ঢুকতেই কেউ একজন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে শিকল এঁটে দিল।

মেয়েটির হাতের আলোয় কামরাটি আলোকিত হয়ে উঠলো। গোয়েন্দার দিকে তাকালো মেয়েটি, তার চোখ মুখে মধুর হাসি। আনিস সেই হাসিমাখা মুখের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল।

'আমাকে চিনতে চেষ্টা করছো তো?' মেয়েটি বললো, 'এত তাড়াতাড়িই ভুলে গেছো সব?'

আনিস স্মৃতি হাতড়ে মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছিল। মেয়েটি তাকে সাহায্য করার জন্য বললো, 'যখন তুমি আমার শহর থেকে পালিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলে তখন ভাবতে পারিনি তোমাকে আর কখনো হাতের নাগালে পাবো। কিন্তু দুর্ভাগ্য তোমার, নিজের শহরে এসে আজ আবার বন্দী হয়ে গেলে। এবার আর পালিয়ে যাওয়ার কোন মওকা তুমি পাবে না।'

আনিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার দীর্ঘশ্বাসে যেমন প্রশান্তি ছিল তেমনই ছিল অস্থিরতা। তার স্মৃতিপটে তিনি বছর আগের একটি দিনের কথা মনে পড়ে গেল। গোয়েন্দাগীরির জন্য তাকে আক্রা পাঠিয়েছিলেন আলী।

আক্রা তখন খৃষ্টানদের দখলে। সেখানে তাদের এক বড় পাদরী থাকতো। তাকে সবাই ডাকতো গ্রেট ফাদার বলে। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রুসেড রাজারা যেসব বাহিনী পাঠাতো, অভিযানের আগে তার সেনাপতিরা অবশ্যই একবার আক্রা আসতো সেই গ্রেট ফাদারকে অভিবাদন করে দোয়া নিতে। কারণ সামরিক দিক থেকে স্থানটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই ফাদারের কাছে এমন সব গোপন তথ্য থাকতো, যা অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণে অপরিহার্য বিবেচিত হতো।

এ ব্যাপারটি আলী বিন সুফিয়ানের নজরে এলে তিনি সেখানে নিজস্ব গোয়েন্দা পাঠানো জরুরী মনে করলেন। তখন সেখানে যে বাহিনী পাঠানো হয় আনিস ছিল সেই দলের একজন।

ওরা সেখানে ছিল খৃষ্টানের ছদ্মবেশে। সেখানে ওরা এক গোপন আড্ডা বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু গোয়েন্দাগীরি হচ্ছে এক মরনঘাতি খেলা। পদে পদে বিপদ, পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি। মুহূর্তে আমূল পাল্টে যায় ঘটনার দৃশ্যপট।

তাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, হঠাৎ একদিন তাদের মধ্য থেকে তিন চারজন ধরা পড়ে যায়। মোকাবেলা করতে গিয়ে দুইজন শহীদ হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আনিস বেঁচে যায়। দুশমনের দুর্ভেদ্য জাল কেটে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয় সে। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে সোজা এসে রিপোর্ট করে কায়রো।

আনিসের গায়ের বর্ণ ফর্সা। দেহের গঠন এবং আকৃতিও ছিল খুবই নিখুঁত ও আকর্ষণীয়। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র প্রবাদটি যদি সত্যি হয় তাহলে তার জীবনের সাফল্যের জন্য তার চেহারাটিই যথেষ্ট। কিন্তু এ বিষয়টি সম্পর্কে কখনোই তাকে সজাগ বলে মনে হয়নি। সে তার সাফল্যের জন্য বুদ্ধি ও মেধাকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতো।

আলী বিন সুফিয়ান তাকে খুব বিচক্ষণ ও সতর্ক গোয়েন্দা মনে করতেন। অশ্বারোহী হিসেবে সে যেমন পটু ছিল তেমনি চৌকস ছিল তলোয়ার ও নেজাবাজিতে। সামরিক মহড়ায় সে দর্শকদের অভিভূত করে কুড়িয়ে নিত হাততালি। এমনকি অভিনয়েও তার দক্ষতা ছিল সকলের ঈর্ষার বস্তু।

হুজুরের সামনে সে গতকাল যখন কাঁদছিল, হুজুরও ভাবতে পারেননি, এটা বাস্তব নয়, অভিনয়। এতটা স্বাভাবিক ও আন্তরিক ছিল তার অভিনয়।

আক্রাতে এক খৃষ্টান নামে পরিচিত ছিল আনিস। সেখানে সে এক বেদনাময় জীবনের কাহিনী ফেঁদে মানুষের সহানুভূতি কুড়িয়েছিল। সে বলেছিল, 'হলবে মুসলমান সৈন্যদের অশ্বারোহণ ও যুদ্ধের ট্রেনিং দেখে আমারও সৈনিক হওয়ার ইচ্ছে জাগে। আমি ঘোড়দৌড়ের বাহিনীতে ভর্তি হয়ে ঘোড়সওয়ারী শেখার সাথে গোপনে অস্ত্রের ট্রেনিং নেয়া শুরু করেছিলাম।

মুসলমানরা কেমন করে যেন এ খবর পেয়ে যায়। এক রাতে একদল ডাকাত আমাদের বাড়ীতে হামলা চালায়। তারা আমার পিতা-মাতাকে হত্যা করে এবং আমার দুই যুবতী বোনকে তুলে নিয়ে যায়। আমার ওপর হামলা হতে পারে এই আশংকায় এর কয়েক আগের রাত থেকেই আমি সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। রাতে আমি বাড়ীতে থাকতাম না, থাকতাম এক বন্ধুর বাড়ী। সে রাতে আমি বাড়ী ছিলাম না বলে প্রাণে বেঁচে যাই।

এ হামলার পর হলবে আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব ছিল না। আমি পরের দিন এক গোপন জায়গায় লুকিয়ে থেকে রাতের অন্ধকারে হলব থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসি। আসার সময় আমি আমার পৈত্রিক সম্পত্তির কিছুই আনতে পারিনি। সব হলবে ফেলে রেখে কেবল আমার প্রিয় ঘোড়াটি সঙ্গে নিয়ে হলব ত্যাগ করি। অনেক কষ্টে, অনাহারে অর্ধাহারে ভুগতে ভুগতে অবশেষে আমি এই আক্রা এসে পৌঁছতে সক্ষম হই।'

তার সুন্দর চেহারা আর মায়াময় চাহনি দেখে সবাই তার কথা বিশ্বাস করে নেয়। গ্রেট ফাদার তার সৈনিক হওয়ার আগ্রহ দেখে তাকে গীর্জায় না রেখে স্থানীয় সেনা ছাউনিতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে সে অল্প সময়েই নিজেকে একজন ভাল অশ্বারোহী ও যোদ্ধায় পরিণত করতে সক্ষম হয়। সেনা অফিসার তার বুদ্ধি ও দক্ষতা দেখে তাকে অল্পদিন পরেই সেখানকার একজন প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেন। সেই থেকে সে আক্রার সেনা ক্যাম্পে একজন শিক্ষক হিসাবে কাজ করছিল।

নিয়মিত সৈনিকদের ট্রেনিং দেয়ার কাজ ক্যাম্পের পুরাতন ও নিয়মিত প্রশিক্ষকদের হাতেই ছিল। সে ট্রেনিং দিত স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যুবক-যুবতীদের।

এখানে যারা ট্রেনিং নিতে আসতো তাদের অধিকাংশই ছিল সুন্দরী ও যুবতী মেয়ে। বড় বড় সামরিক অফিসারদের সন্তানরাও ট্রেনিং নিতে আসতো। সে জানতে পারল, এ সব মেয়েদের ট্রেনিং দিয়ে মুসলমান এলাকায় গোয়েন্দাগীরি করতে পাঠানো হয়। পরে যেসব পুরুষরা তার কাছে ট্রেনিং নিতে এসেছিল, আনিস খোঁজ নিয়ে জেনেছে, এরা সবাই ছিল খৃষ্টান গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য। সে ওদের সাথে এমনভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের নিকট থেকে দামী দামী তথ্য ও রিপোর্ট সে অনায়াসেই সংগ্রহ করে নিতে পারতো।

যে মেয়েটি এখন কায়রোর শহরতলীর এক গ্রামের গোপন কামরায় বসে তাকে বলছে, 'এবার আর পালিয়ে যাওয়ার কোন মওকা তুমি পাবে না' সে একদিন আক্রাতে

তারই শাগরেদ ছিল। মেয়েটি গোয়েন্দাগীরিতে দক্ষ হলেও অশ্ব চালনা জানতো না। তাকে অশ্বারোহণের ট্রেনিং দেয়ার ভার পড়েছিল মার্করূপী আনিসের হাতে।

সুদর্শন মার্ককে প্রথম দেখাতেই ভাল লেগে গিয়েছিল মাইসার। ট্রেনিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে ওদের মধ্যে চলতে লাগলো মন দেয়া-নেয়ার খেলা। এভাবেই উস্তাদ শাগরেদের সম্পর্ক চুকিয়ে ওরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হলো। তারপর সেই বন্ধুত্ব গিয়ে ঠেকলো প্রেমিক-প্রেমিকাতে।

মেয়েটির ভালবাসায় কোন খাঁদ ছিল না। তাই মেয়েটি সিদ্ধান্ত নিল, গোয়েন্দাগীরি পেশা ত্যাগ করে সে মার্কের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবন যাপন করবে।

কিন্তু মার্ক মেয়েটির সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল নিছক দায়িত্বের কারণে। মেয়েটির সাথে তার সম্পর্ক যত মধুর হবে ততই তথ্য সংগ্রহের সুবিধা হবে ভেবে সে মেয়েটির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

ওরা দু'জনই ভালবাসার জোয়ারে ভেসেছিল ঠিক, কিন্তু মাইসার মত মার্ক ভালবাসার টানে তার আসল দায়িত্বের বিষয়টি ভুলে যায়নি। মেয়েটির গোয়েন্দাগীরিতে মন ছিল না, তার মন তখন মার্ককে নিয়ে ভালবাসার প্রাসাদ নির্মাণে ব্যস্ত।

একদিন আক্রাতে দুই মুসলমান গোয়েন্দা ধরা পড়ে গেল। তাদের একজন কঠিন শাস্তির মুখে তার দলের সমস্ত লোকজনের নাম ঠিকানা বলে দিল। যাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল তাদের মধ্যে ছিল গোয়েন্দা মার্কও।

স্বাভাবিকভাবেই সে যে মুসলমানদের গোয়েন্দা, এ কথা জেনে গেল খৃস্টানরা।

খৃস্টানরা মার্কের পেছনে টিকটিকি লেলিয়ে দিল। তারা মার্কের প্রতিটি গতিবিধির ওপর কড়া দৃষ্টি রাখা শুরু করলো। একজন গোয়েন্দা হিসাবে খবরটি জেনে গেল মাইসাও। সে একদিন আশ্চর্য হয়ে মার্ককে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, তুমিতো আর গোয়েন্দা নও, মুসলমানও নও? কিন্তু আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা তোমাকে সন্দেহ করছে কেন? তুমি কি জানো তোমার উপর আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ 'কড়া দৃষ্টি রাখছে?'

আনিসের জন্য এ ছিল এক অতি মূল্যবান খবর। মাইসার কাছ থেকে এ খবরটি সময় মত না পেলে তার জীবন প্রদীপ হয়তো সেখানেই নিঃশেষ হয়ে যেতো। প্রশ্ন শুনে মার্ক হেসে বলেছিল, 'আমাকে সন্দেহ করছে শুনে খুশী হলাম। এতে প্রমাণ হলো, আমাদের গোয়েন্দারা যথেষ্ট তৎপর। এভাবে প্রতিটি লোককেই মাঝেমধ্যে যাচাই বাছাই করা দরকার। যখন সন্দেহ দূর হবে তখন আপনাতেই দৃষ্টি সরিয়ে নেবে।'

মুখে এ কথা বললেও ভেতরে ভেতরে সে খুব অস্থিরতা বোধ করছিল। রাতে সে এমন একজনের সাথে দেখা করল, আক্রার সাধারণ মুসলমান গোয়েন্দারা যার সম্পর্কে কিছুই জানতো না। কেবল কমান্ডাররা জানতো, বিপদে পড়লে তার সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

সে লোক আনিসকে দেখেই বললো, 'আমি তোমার সাথে দেখা করবো ভাবছিলাম। তোমার দলের অনেক সদস্যের নাম

পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেছে। সেই তালিকায় তোমার নামও আছে। তোমার জন্য আর এক মুহূর্তও আক্রা থাকা নিরাপদ নয়। তোমাকে এখনি এখান থেকে পালাতে হবে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, এখান থেকে বেরিয়ে তুমি আর তোমার আস্তানায় ফিরবে না, সোজা কায়রোর পথ ধরবে।'

এ লোকের পরামর্শই হুকুম। আনিস সেখানে আর দেরী না করে তাকে সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এলো।

কামরা থেকে বেরিয়ে পথে নেমেই আনিস টের পেলো, দুটি লোক তাকে অনুসরণ করছে। সে অনুসরণকারীদের খসানোর জন্য আক্রার বিভিন্ন পথে হাঁটলো, নানা রকম চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

অবশেষে সে এক ঘোড়ার আস্তাবলের কাছে এসে থেমে গেল। যে লোক দু'জন তাকে অনুসরণ করছিল এবার তারা এগিয়ে এলো তার কাছে। আনিস আস্তাবলে ঢুকে দ্রুত হাতে একটা ঘোড়ার মুখে লাগাম পরিয়ে বাইরে নিয়ে এলো। আস্তাবল থেকে বেরিয়েই সে ওদের সামনে পড়ে গেল। লোক দু'জন তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছো?'

এ প্রশ্নের যে জবাবই দেয়া হোক না কেন, লোক দু'জন তাতে সন্তুষ্ট হবে না, জানে আনিস। তার বুদ্ধি তাকে বললো, 'এখন আর কোন কথা নয়, জলদি পালাও।'

সে লাফিয়ে ঘোড়ার উপর উঠে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এক লোক তাকে বাঁধা দিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে ঘোড়ার পায়ের তলে পিষে গেল। আনিস প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে আক্রা থেকে বের হয়ে এলো।

'মাইসা, আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি।' সে মেয়েটিকে বললো। তিন বছর পর তারা দু'জন একে অপরকে দেখছে। 'আমি তোমাকে এখানে এই অবস্থায় দেখে মোটেই বিস্মিত নই। কারণ আমি জানি তুমি এখন পরিপূর্ণ এক গোয়েন্দা।'

'তিন বছর আগে তোমার ফাঁদে পড়ে আমি গোয়েন্দাগীরি ত্যাগ করতে চেয়েছিলাম। গোয়েন্দাগীরি ছেড়ে আমি তোমাকে নিয়ে ঘরও বাঁধতে চেয়েছিলাম।' মেয়েটি বললো, 'তখন তুমি যদি বলতে, তুমি মুসলমান এবং গোয়েন্দা, তবুও তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করতাম না। বরং তোমার সঙ্গে বিনা দ্বিধায় পালিয়ে যেতেও প্রস্তুত ছিলাম। তুমি পালিয়ে যাওয়ার পর যখন জানতে পারলাম, তুমি মুসলমান এবং গোয়েন্দা ছিলে তখনও তোমার প্রতি আমার কোন ঘৃণা জন্মেনি। কিন্তু তোমাকে হারিয়ে আমি ভীষণ ব্যথা পেয়েছিলাম। আমার ভালবাসাকে অপমান করেছো বলে কষ্ট পেয়েছিলাম।'

'কেন, এখন কি তোমার মনে আমার জন্য কোন ভালবাসা নেই?' আনিস বললো, 'এখন তো তুমি আমার দেশেই আছো। এখানে যেমন আমার জীবনের নিরাপত্তা আছে, তেমনি তুমি চাইলে তোমার নিরাপত্তা দেয়ার সামর্থও আজ আমার আছে। তুমি জানো, সেদিন পালিয়ে আসা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। মৃত্যু আমাকে এমনভাবে তাড়া করেছিল যে, তোমার কাছ থেকে বিদায় নেয়ারও কোন উপায় ছিল না। আমি তোমাকে ধোঁকা দেইনি, নিরুপায় হয়ে

বিচ্ছেদ মেনে নিয়েছিলাম। তবে আজ যদি তুমি আমার সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পারো, কথা দিচ্ছি, আর কখনো এমন বিচ্ছেদে তোমাকে পড়তে দেবো না।'

'মন্দ বলোনি। হ্যাঁ, স্বীকার করি তোমার প্রতি ভালবাসা আমার এখনও আছে।' মেয়েটি বললো, 'কিন্তু সেই ভালবাসাকে ছাপিয়ে আছে আমার দায়িত্বে বোঝা। আর এ জন্য তুমিই দায়ী। আমি তো তোমার জন্য গোয়েন্দাগীরি ছেড়েই দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমিই তা হতে দাওনি। তুমি আমার ইচ্ছাকে পদদলিত করে আমাকে এই জঘন্য পেশায় ডুবে থাকতে বাধ্য করেছো।

তুমি আমাকে ত্যাগ করার পর সেখানকার মরুভূমির ওপর দিয়ে অনেক লূ-হাওয়া বয়ে গেছে। আমার অন্তরের প্রেম আর ভালবাসা শুকিয়ে গেছে সেই লূ-হাওয়ায়। আমি ট্রেনিং শেষে পরিপূর্ণভাবে মন দিতে বাধ্য হয়েছি গোয়েন্দাগীরিতে। এখন আমি কোন আনাড়ি গোয়েন্দা নই, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক ঝানু গোয়েন্দা। এই ঝানু গোয়েন্দা হতে গিয়ে নিজের সব সুকুমার বৃত্তিগুলোকে কোরবানী করতে হয়েছে। এমনসব জঘন্য ও অপবিত্র কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে, যার কথা কোনদিন কল্পনাও করিনি। আমি এখন আর কোন প্রেম ভিখারী নারী নই, আমি এখন ছলনাময়ী এক নিষ্ঠুর ডাইনী।

তোমাকে নিয়ে যতদিন স্বপ্ন দেখেছি ততদিন তোমার ধর্মের প্রতি আমার কোন আক্রোশ বা ঘৃণা ছিল না। হয়তো তোমার সাথে তোমার ধর্মকেও ভালবেসে ফেলতে পারতাম।

কিন্তু আজ? আজ ইসলামের প্রতি চরম আক্রোশ ও ঘৃণা নিয়ে আমি ছুটে চলেছি তার বিনাশ সাধনের জন্য। এখন আমি জানি, মুসলমান নিধন করতে পারলেই নিঃশেষ হবে ইসলাম। তোমার প্রতারণা মুসলমানদের প্রতি আমার আক্রোশ ও নিষ্ঠুরতা আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

শোন আনিস, তোমার প্রেমে যখন হাবুডুবু খাচ্ছিলাম তখন তোমার জন্য মরতেও আমার কোন দ্বিধা ছিল না। আর এখন? এখন আমি এমন নিষ্ঠাবান গোয়েন্দা যে, প্রয়োজনে নিজের সকল ভাল লাগা ভালবাসাকে নিজ হাতে হত্যা করতেও দ্বিধায় কাঁপবে না আমার হাত।

এখন তুমি আমার এক বন্দী ছাড়া আর কেউ নও। আমি আমার মিশনকে ধোঁকা দিতে পারবো না। আমি যার সঙ্গে এসেছি তিনি জানতেন না, তুমি গোয়েন্দা। আমিই তাকে বলে দিয়েছি, তুমি এক গোয়েন্দা। আমি তাকে আক্রার সব কাহিনী বলে দিয়েছি। যদি আমি তোমাকে উঠান দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখে না ফেলতাম তবে আমরা সবাই গ্রেফতার হয়ে যেতাম। অতএব বুঝতেই পারছো, তোমাকে আমিই ধরিয়ে দিয়েছি।'

'যে পীর সাহেব অদৃশ্যের খবর বলতে পারেন, তিনি মুসলমান না খৃষ্টান?' গোয়েন্দা আনিস তাকে প্রশ্ন করলো।

'এখন এ প্রশ্ন করে আর কি হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর জানা তোমার জন্য অবান্তর।' মেয়েটি বললো।

'গোয়েন্দাগীরির এটাই তো বড় দোষ। রক্ত মাংসের সাথে একবার হয়ে মিশে গেলে তা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।'

গোয়েন্দা বললো, 'মৃত্যুর আগেও জানার আগ্রহ থেকেই যায়। এখন এ সংবাদ বলতে তোমারই বা এত আপত্তি কেন? এখন তো কোন খবর আর আমি বাইরে পাঠাতে পারবো না।'

'ইনি মুসলমান!' মেয়েটি বললো, 'ইনি মুসলমানের দুর্বলতা সম্পর্কে এত কিছু জানেন যে, তাকে আমরা উস্তাদের উস্তাদ বলি!'

কামরার দরজা খুলে গেল। হুজুর এক লোকের সঙ্গে কামরায় প্রবেশ করলো। মেয়েটিকে বললো হুজুর, 'যদি তোমার কথা শেষ হয়ে থাকে তবে বাইরে যাও।'

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আনিসের দিকে কয়েক পলক করুণ নয়নে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ঘুরে শ্লথ পায়ে বাইরে চলে গেল।

কালো দাড়িওয়ালা হুজুর তাকে প্রশ্ন করলো, 'বুদ্ধিমান যুবক, আমাকে শুধু এটুকুই বলো, আমাদের পরিচয় তুমি কাকে কাকে বলে দিয়েছো। তুমি কি আলী বিন সুফিয়ানকে বলে দিয়েছো, আমি এক সন্দেহজনক লোক?'

'না। সত্যিই আমি গোয়েন্দা, কিন্তু এখানে গোয়েন্দাগীরির জন্য আসিনি।' গোয়েন্দা বলিষ্ঠভাবে উত্তর দিল।

হুজুরের হাতে ছিল চামড়ার চাবুক। আনিসের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে চাবুক আঘাত হানল তার পিঠে। একবার নয়, ক্রমাগত কিছুক্ষণ এত দ্রুত চাবুক চললো যে, আনিস ঘটনার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

হুজুর হঠাৎই আবার মারপিট থামিয়ে বললো, 'আমি শুধু সত্যি কথাটা শুনতে চাই।'

আনিস এ কথার কোন জবাব না দেয়ায় হুজুর আবার চাবুক তুলল। দু'তিনবার চাবুক তুলতেই অকস্মাৎ খুব জোরে শব্দ করে খুলে গেলো দরজার পাল্লা। মেয়েটি দ্রুত ভিতরে ঢুকে বললো, 'ওকে আর মারবেন না।' সে হুজুরের দু'টি হাত আকড়ে ধরে অনুনয় করে বললো, 'ওর কাছ থেকে আপনি যা জানতে চান আমাকে বলুন। আমি ওর কাছ থেকে সব কথা আদায় করে আপনাকে বলে দিচ্ছি।'

'না, আমি কিছুই বলবো না।' আনিসের কণ্ঠে দৃঢ়তা।

আনিসের কথা শেষ হতেই হুজুর সঙ্গে সঙ্গে আবার চাবুক তুললেন। তিনি চাবুকটি উঠিয়ে মারতে যাবেন, মেয়েটি দৌড়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এবং চিৎকার করে বললো, 'একে মেরো না। এর শরীরের প্রতিটি আঘাত আমার অন্তর ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে।'

'তুমি একে বাঁচাতে চাও?' সঙ্গের লোকটি গর্জন করে উঠলো।

'না!' মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'ও যদি কিছু না বলে তবে তলোয়ারের এক আঘাতে ওর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। কিন্তু এভাবে নির্যাতন করে কষ্ট দিয়ে মেরো না।'

কিন্তু এ আবেদনে কোন ফল হলো না। হুজুর সঙ্গের লোকটিকে চোখে ইশারা করে বললো, 'একে বাইরে নিয়ে যাও।'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল লোকটি। ওকে পাশের কামরায় নিয়ে অন্য মেয়েটাকে বললো, 'দরজা বন্ধ করে দাও। দেখো মাইসা যেন বাইরে যেতে না পারে।'

লোকটি ফিরে এলো কামরায়। আনিসের ওপর এবার শুরু হলো তথ্য আদায়ের জন্য অকথ্য নির্যাতনের নতুন মাত্রা। দুইজনে পালা করে তাকে দিচ্ছিল নানা রকম লোমহর্ষক শাস্তি। এ শাস্তি চললো রাতভর।

সারা রাত ওরা তাকে শুতে দিল না, বসতেও দিল না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উত্যক্ত করলো তাকে, কিন্তু সে নির্বিকার। অনেক প্রলোভন দেখালো, কিন্তু তাতেও কাজ হলো না।

প্রলোভনেও কাজ না হওয়ায় আবার শুরু হলো তার উপর আঘাতের পর আঘাত। সেই অসহ্য আঘাত খেয়েও মূর্তির মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

এভাবে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে এক সময় সে লুটিয়ে পড়লো। সকালের দিকে জ্ঞান হারালো আনিস।

ভোর। সারা রাত কেঁদে কেঁদে সকালের দিকে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে সামান্য সময়ের জন্য মাত্র। সহসাই সে আবার জেগে উঠলো এবং চারদিক তাকিয়ে দেখলো ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই রাতের অন্ধকার কেটে ফর্সা হয়ে এসেছে প্রকৃতি।

মাইসা লক্ষ্য করে দেখলো, এখন আর চাবুকমারা বা আনিসের আর্তনাদ কিছুই শোনা যাচ্ছে না। সে সহসা উঠে

বসলো এবং দ্রুত কামরার কবাট খুলে বাইরে এসে গিয়ে ঢুকলো আনিসের কামরায়।

আনিস তখন অর্ধ-মৃত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছিল। তার সারা গায়ে চাবুক ও তলোয়ারের খোঁচার রক্তাক্ত দাগ। সে মেঝেতে পড়েছিল বেহুশ হয়ে। এখন তাকে আঘাত করা আর আদর করা সমান কথা। কারণ কোন কিছু অনুভব করার মত অবস্থা তার নেই।

মেয়েটি কামরায় ঢুকে দেখলো রক্তাক্ত শরীর নিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে আনিস। সে আনিসের এই করুণ পরিণতি সহ্য করতে পারলো না। কতক্ষণ বিহবল চিত্তে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল, শেষে সইতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উঁপর। আনিসের বুকের ওপর পড়ে থেকে অনেকক্ষণ অঝোর ধারায় কাঁদলো। বার বার বললো, 'হায়! এ আমি কি করলাম! এ দশা যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

অনেকক্ষণ পরে বুক থেকে মাথা তুলে বললো, 'আমি তো তোমাকে অনেক বার বলেছি, তুমিই আমার প্রথম ও শেষ ভালবাসা। তোমার কষ্টই আমার কষ্ট, তোমার মৃত্যুই আমার মৃত্যু।'

আরো কিছুক্ষণ পরের কথা। মেয়েটির মনে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ হলো। দায়িত্বের কথা মনে হতেই তার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। বলল, 'হ্যাঁ, আমার দায়িত্ব! আমি তো আমার দায়িত্ব ঠিকঠাক মতই পালন করেছি। আমিই তো একে ধরিয়ে দিয়েছি! আমিই তো বলেছি, ওকে

মেরে ফেলো। কিন্তু এতো কষ্ট! এতো কষ্ট! হায় খোদা, এ আমি কি করলাম!'

আনিস তখনো বেহুশের মত পড়েছিল। মাইসার মনে হলো, সামান্য নড়ে উঠলো আনিস। হ্যাঁ, তাইতো! তাহলে তার চেতনা ফিরে আসছে! সে তার হৃদস্পন্দন শোনার জন্য আনিসের বুকের ওপর কান পাতলো। আবার নড়ে উঠলো আনিস। আলগোছে একটি হাত তুলে দিল মাইসার পিঠের ওপর।

মেয়েটি তেমনি পড়েছিল তার বুকের ওপর। পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এলো আনিসের। চোখ মেলেই দেখতে পেলো মাইসাকে। ক্ষীণ স্বরে বললো, 'তুমি চলে যাও। শেষে এমন না হয় যে, আমি আমার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই। এই কঠিন শাস্তি ও মৃত্যু আমার পাওনা ছিল। তুমি তোমার দায়িত্বের উপরে কুরবানী হতে চাও, আমি আমার ধর্মের উপরে কুরবানী হতে চাই। দোহাই তোমার, আমাকে বাঁধা দিও না। আমার জীবন আজ কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে। আমি আমার প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি। আমার বেহেশতী বন্ধুরা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তুমি যাও মাইসা! আমার বুকের ওপর থেকে সরো! দোহাই খোদার, সরে যাও তুমি!'

মেয়েটি এতক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আনিসের কথা শুনে পাগলের মত বিলাপ শুরু করলো, 'দোহাই আনিস, থামো! চুপ করো! মরতে যদি হয় এক সাথেই মরবো। নিয়তি আমাকে আবার তোমার কাছে টেনে এনেছে আমরা এক

সাথে থাকবো বলে। বাঁচলে আমরা এক সাথেই বাঁচবো আর মরতে হলেও এক সাথেই মরবো। ......'

মেয়েটির বিলাপ তখনো চলছিল, হুজুর কামরায় ঢুকে এ দৃশ্য দেখে কঠিন সিদ্ধান্তে এলো। সঙ্গের লোকটিকে বললো, 'এই হতভাগী মেয়েটাকে অন্য কোন কামরায় নিয়ে বন্দী করে রাখো।' তারপর পড়ে থাকা গোয়েন্দার পিঠে শপাং করে একটি বাড়ী দিয়ে বললো, 'কিহে মুজাহিদ! জবান খুলবে, নাকি আরো অষুধ দিতে হবে?'

গত রাতটি আলী বিন সুফিয়ানের কেটেছে অসম্ভব ব্যস্ততায়। সাদা দাড়িওয়ালা যে লোককে অনুসরণ করে কায়রো এসে পাকড়াও করেছিলেন তাকে রাতভর জেরা করে জেনে নিয়েছিলেন সমস্ত তথ্য। কালো দাড়িওয়ালা হুজর কে, তার এখানে আসার উদ্দেশ্য ও মিশন কি, অবশেষে সবই তিনি জানতে পেরেছেন। এই করতে করতেই দিনের অর্ধেক সময়ও অতিবাহিত হয়ে গেল।

তখনি তার মনে পড়লো গোয়েন্দা আনিসের কথা। আনিসের কথা মনে হতেই আলী বিন সুফিয়ান অধীর হয়ে উঠলেন। সে এখনো এলো না কেন? তিনি ব্যাকুল হয়ে আনিসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। আলী বুঝতে পারলেন, তাঁর পাঠানো গোয়েন্দা নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে। হয়তো হুশিয়ার দরবেশ সন্দেহবশত তাকে গ্রেফতার করে নিয়েছে।

দিনের শেষ প্রহর। আলী বিন সুফিয়ান আর অপেক্ষা করা সমীচিন মনে করলেন না। তিনি আনিসকে উদ্ধারের জন্য একটি কমাণ্ডো দল গঠন করে রাতের অন্ধকার নেমে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

যে বাড়ীটিকে ওরা আস্তানা বানিয়েছিল তা তিনি আগেই দেখে এসেছিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে তিনি সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

তাঁর কমান্ডো বাহিনী এত দ্রুতবেগে গ্রামে প্রবেশ করলো যে, গ্রামের কেউ কাউকে সতর্ক করার সুযোগ পেল না। গ্রামে ঢুকে চোখের পলকে তারা বাড়ীটিকে ঘিরে ফেলল। তারপর বাড়ীর দেয়ালের সাথে ঘোড়া লাগিয়ে লাফিয়ে পড়লো ভেতরে। বাড়ীর ভেতরের কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই কমাণ্ডোদের ল্যাথির আঘাতে ভেঙ্গে গেল দরজা। কামরায় ঢুকে ওরা বাড়ীর সকলকেই গ্রেফতার করে নিল।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা তখনো বেহুশের মত পড়ে ছিল মেঝেতে। তার প্রাণবায়ু বেরোনোর জন্য যেন শেষ চেষ্টা করছে।

অপরদিকে পাশের কামরায় ছিল মেয়েটি। কমাণ্ডোরা ওকে গ্রেফতার করার জন্য গিয়ে দেখে মেয়েটি বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার বিছানা।

ওরা তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে ধরে তুলতে গিয়ে দেখলো মেয়েটির বুকে একটি ছুরি বিদ্ধ হয়ে আছে। তখনো মারা যায়নি সে, কমাণ্ডোদের দেখে মুখে কষ্ট করে হাসির রেখা

টেনে কোন রকমে বললো, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, আমি নিজেই আত্মহত্যা করেছি।'

কথাটুকু বলেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। কিন্তু কেউ জানতে পারলো না, কেন মেয়েটি আত্মহত্যা করলো।

পর দিন। সেই গ্রাম ও আশপাশের গ্রামের অনেক লোক বাড়ীর সামনে এসে জড়ো হলো। আলী বিন সুফিয়ান কালো দাড়িওয়ালা হুজুরকে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'কি উদ্দেশ্য এবং কি মিশন নিয়ে তুমি ও তোমার সাথীরা এখানে এসেছো সবার সামনে খুলে বলো।'

লোকটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আলী বললেন, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই তুমি পার পেয়ে যাবে মনে করো না। তোমরা কে এবং কেন এখানে এসেছো সব আমি জানি। আমি এও জানি, রমলা থেকে ফেরার পথে সৈনিকদের যে কাহিনী তুমি শুনিয়েছিলে তা ভুল। কোত্থেকে কেমন করে রাতের আঁধারে তোমার কাছে খাবার পৌঁছতো সে রহস্যও আমি উদ্ধার করেছি। তুমি সত্যি কথা জনতার সামনে স্বীকার করলে তোমার শাস্তি খানিকটা লাঘব হতে পারে। আর যদি তুমি মুখ খুলতে অস্বীকার করো তবে আমার হাতে এমন অস্ত্র আছে যাতে তোমার মুখোশ খুলে যাবে। কেন তুমি সৈন্য বাহিনী ও সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে দুর্নাম ছড়াচ্ছো, এর উত্তর যদি তুমি না দাও তবে তোমার হয়ে সে উত্তর দেবে কাল যাকে সাদা দাড়ি পরিয়ে কায়রো পাঠিয়েছিলে তোমার সেই বন্ধু।'

আলীর মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে সে বললো, 'আপনি তাকেও গ্রেফতার করেছেন?'

আলী বললেন, 'তাহলে পেছন ফিরে দেখো তো, ওকে চিনতে পারো কিনা?'

লোকটি পিছন ফিরে সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে বললো, 'আমি যদি সব সত্য কথা স্বীকার করি তবে কি আপনি আমার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করবেন?'

'তেমন ওয়াদা করার কোন প্রয়োজন নেই আমার। সব তথ্য এখন আমার হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলে তুমি সব স্বীকার করতে পারো আর যদি স্বীকার করতে না চাও, তাতেও কিছু আসে যায় না আমার।'

ছদ্মবেশী হুজুর বললো, 'আমি অস্বীকার করছি না, এখানে আমরা গোয়েন্দাগীরি করতে এসেছিলাম।' তারপর সে তার এবং তার সাথীদের এখানে আসার কারণ খুলে বললো।

'এখানে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি জানতে পেরেছি, মৃত মেয়েটা মুসলমান নয় খৃষ্টান ছিল। তার মৃত্যুর কারণ কি?'

ছদ্মবেশী হুজুর আনিসের সাথে তার প্রেমের কাহিনী খুলে বললো ভর জলসায়।

'আর পথে মরুভূমির মাঝে টিলার পিছনে যে আগুন ছিল এবং তার কাছে যে পানির মশক ও খেজুর ছিল, সে রহস্যের সমাধান কি?'

'ওখানে আসলে কোন রহস্য ছিল না। খাদ্য ভাণ্ডার নিয়ে আমাদের একদল লোক সেই পথে লুকিয়ে ছিল। আমাদের

কাফেলা থেকে দেখা যায় না এমন দূরত্ব বজায় রেখে তারা আমাদের অনুসরণ করে পথ চলতো। রাতে আমাদের কাছে এসে পাখীর ডাকের মাধ্যমে সংকেত দিলে আমরা সে খাবার সংগ্রহ করে নিতাম।'

আলী বিন সুফিয়ান কারাগারের গোপন কক্ষে আগের রাতে বন্দী লোকটি যে জবানবন্দী দিয়েছিল তার সাথে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন ধাপ্পাবাজ হুজুরের রিপোর্ট। লোকটির বর্ণনা থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে জানা গেছে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক সৈন্যদলকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা একটি ফাঁদ পেতেছিল হুজুরের মাধ্যমে। সে ফাঁদ যথেষ্ট কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কাফেলার সকলেই হুজুরের কথা কেবল বিশ্বাস করেনি, অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছিল তার।

'তোমরা এখানে কি পদ্ধতিতে কাজ হাসিল করছিলে?' প্রশ্ন করলেন আলী বিন সুফিয়ান।

'যেখানে লোক সমাগম বেশী, যেমন বাজার, মসজিদ, এসব এলাকায় মিশরের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও দুর্ণাম ছড়িয়ে আইয়ুবী ও তার বাহিনীর প্রতি জনতার যে আস্থা ও বিশ্বাস আছে তা ধ্বংস করে দেয়াই ছিল আমাদের দায়িত্ব। ইসলামী জনতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিশেষভাবে আমরা বেছে নিয়েছিলাম মুসল্লীদের। আমাদের এ অপপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিল সামরিক বিভাগ ও সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সন্দেহ সৃষ্টি করা। এতে দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীর মাঝে বিভেদের এক অদৃশ্য দেয়াল খাঁড়া হয়ে যাবে। এ অনৈক্য খৃষ্টানদের অনেক উপকারে আসবে।'

'তোমাদের এ মিশনে মিশর প্রশাসনের কে কে জড়িত?'

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আবার চুপ করে গেল লোকটি। আলী বললেন, 'সে তালিকা আমি আগেই পেয়েছি। তোমার কাছ থেকে শুনে নিশ্চিত হতে চাই তালিকাটি সঠিক, নাকি দেশপ্রেমিক লোকদেরকে কায়দা করে ফাঁসিয়ে দেয়ার চক্রান্ত হচ্ছে।'

লোকটি মিশর প্রশাসনের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম করে বললো, 'এরা সময় সুযোগ মত আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছেন। তবে এরা কেউ আমাদের দলের লোক নন।'

'প্রশাসনের লোক ছাড়া বিশেষভাবে আর কাদের সহযোগিতা পাচ্ছো?'

'আব্বাসীয় খেলাফতের ক্ষমতাচ্যুত শাসকরা গোপন সংগঠন গড়ে তুলেছে। তারা আমাদের তৎপরতা সম্পর্কে জানে এবং যে কোন রকমের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকে।'

আলী বিন সুফিয়ান বুঝলেন, শত্রুরা সব একজোট হয়ে গেছে। কেবল খৃস্টান নয়, আইয়ুবীর ক্ষমতারোহণে যাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে সেইসব মুসলমানেরাও জড়িত হয়ে গেছে এই জোটে।

'যখন সামরিক বিভাগ ও জাতির মধ্যে ঘৃণা ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়ে যায়, মনে করবে সেই জাতির বিশ্ব জোড়া সুনাম ও শক্তি নিঃশেষ ও ধ্বংস হয়ে গেছে।' সুলতান

আইয়ুবী দৃঢ়তার সাথে এ কথা বললেন। আলী বিন সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে তিনি আরো বললেন, ‘সকল মসজিদের ইমামকে এক জায়গায় সমবেত করো। রমলা যুদ্ধে পরাজয়ের প্রকৃত কারণ তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তারাই পারবে সেই কারণ মুসল্লীদের সামনে বর্ণনা করে জাতির মধ্যে যে সন্দেহ ও অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা [illegible] করতে।’

দু’দিন পরের কথা। কায়রোতে সমবেত [illegible] শীর্ষস্থানীয় সকল ইমামগণ। গাজী [illegible] তাদের সামনে তুলে ধর[illegible] প্রকৃত কারণ। ভাষণের শেষ [illegible] ইমামদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, ‘তারপরও আমি বলবো, যদি এ যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য কাউকে দোষারোপ করতেই হয়, তবে সে জন্য আমি দায়ী। কাউকে অপবাদ দিয়ে যদি কেউ তৃপ্তি পেতে চায়, সে যেন সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব আমার উপরেই অপর্ণ করে। হযরত ঈসা (আ.) তাঁর জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্য করেছিলেন ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে, আপন জীবন কুরবানী করে। আমিও ফিলিস্তিনের ভাগ্যাহত মুসলমানদের জন্য জীবন কুরবানী করে এ অপরাধের কাফফারা আদায় করতে চাই। ফিলিস্তিনী মুসলমানদের মুক্তির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যদি আমি জীবন দিতে পারি, সেটাই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওনা।

গদী ও রাজ্যের লোভ নয়, গনীমতের মালের লোভ নয়, যারা আমার সেনাবাহিনীতে শামিল হবে তাদের প্রত্যেককে এ শপথ নিতে হবে, আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ের জন্য আমরণ

চেষ্টার মধ্য দিয়ে ... আমাদের সকল তৎ...রের ... । আ... দূর থেকে আমাদের ...ক... পথে বাধা হয়ে আছে আমাদের ... । আমি আমার বাহিনীকে সেই মানে ...আর ...গেই তাদের নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে ... হয়েছিলাম।

যতক্ষণ এ পরাজয়কে আবার বিজয়ে রূপান্তরিত করতে না পারবো ততক্ষণ আমার রক্তের প্রতিটি কণিকা থেকে সেই আওয়াজই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলবে, এ পরাজয়ের দায়িত্ব একমাত্র আমার। আমার কোন সেনা সদস্য বা কোন গ্রুপ বা দল এ জন্য বিন্দুমাত্র দায়ী নয়। তারা নিষ্পাপ জিন্দাদীল মর্দে মুমীন, যাদের অন্তরে সর্বদা বিরাজ করে আল্লাহর ভয় ও তার অসীম ক্ষমতার সীমাহীন কল্পনা। প্রতিটি পরাজয় থেকে মুজাহিদরা যেমন বিজয়ের পাঠ গ্রহণ করে তেমনি এ পরাজয় আমাদের জন্য বয়ে এনেছে বিজয়ের অমোঘ দুঃসাহস।

o

হলব প্রদেশের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত একটি শান্তিপূর্ণ জনবসতি। এলাকাটার নাম হেমস। বর্তমানে ওটা লেবাননের অন্তর্গত এবং সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। এলাকাটা শান্তিপূর্ণ ছিল এ জন্য যে, তখনও যুদ্ধের কোন ঝুঁকি ও বেগ সামলাতে হয়নি তাদের।

হেমসের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট একটা নদী। নদীর তীর ধরে এগিয়ে গেছে ছোট রাস্তা। তেমন বিশাল সড়ক নয় বলে এ এলাকা দিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে চলাচল তেমন আরামদায়ক নয়, তাই যুদ্ধের তাণ্ডব সইতে হয়নি তাদের।

ইদানিং এ ক্ষুদ্র পথে মাঝে মাঝে খৃষ্টান বাহিনী যাতায়াত শুরু করেছে। বিশাল বাহিনী নয়, সামরিক বাহিনীর ছোটখাট কাফেলা নদী তীরের পথ ধরে এগিয়ে যেতে দেখেছে গ্রামবাসী।

এ অঞ্চলটিতে কোন খৃস্টান নেই। জনবসতির প্রায় সবাই মুসলিম। কয়েক ঘর ইহুদী থাকলেও সকলেই হেমসকে মুসলিম এলাকা বলে গন্য করতো। তারপর সেখানে ইহুদীদের পাশে এক সময় কয়েক ঘর খৃষ্টানও এসে বসবাস শুরু করলো।

এই ইহুদী ও খৃস্টানরা সবাই ছিল ব্যবসায়ী। সে জন্য তারা এলাকার বাইরে দূর দূরান্তে কারবারের জন্য চলে যেত। ফলে তারা বাইরের দুনিয়ার খবরাখবর বেশী রাখতো।

রমলার পরাজয়ের পর তারা এলাকায় ফিরে এসে মুসলমানদের পরাজয়ের কাহিনী এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করতে লাগলো যে, মুসলমানদের মনে তাতে ভীষণ ভয় ও আতংক ছড়িয়ে পড়লো। তারা ক্রুসেড বাহিনীর বিজয়ের কাহিনী এমন ফলাও করে প্রচার করলো, যাতে সবাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়, খৃস্টান বাহিনীই এখন দুনিয়ার অপরাজেয় ও দুর্ধর্ষ বাহিনী।

তাদের এ প্রচারণা ছিল এক ষড়যন্ত্রেরই অংশবিশেষ। উদ্দেশ্য ছিল, হেমসের মুসলমানদের মনে খৃষ্টান শক্তির ভীতি জাগ্রত করা, যাতে সেই ভয়ে এলাকার কোন মুসলমান সেনাবাহিনীতে যোগদান না করে।

কিন্তু কার্যতঃ সেখানে তার উল্টো প্রভাব পড়ে। দেখা গেল, মুসলমানরা ভয় ও আতংকগ্রস্ত হয়ে ঘরে গুটিয়ে বসে থাকার পরিবর্তে দলে দলে জোরে শোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছে। মুশকিল হলো, ওদের এমন সামরিক প্রস্তুতিতে কেউ বাঁধাও দিতে পারে না। কারণ সেখানে খৃষ্টানদের শাসন ছিল না, এলাকাটা ছিল মুসলিম অধ্যুষিত।

হেমসের মুসলমানরা অশ্বারোহণ, বল্লম বা বর্শা ছোঁড়া, অসি চালনা ও তীরন্দাজীর জোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করলো। মুসলমানদের মধ্যে এ জেহাদী জযবা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি ছিলেন এলাকার বড় মসজিদের খতিব।

তিনি ছিলেন একজন জবরদস্ত পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। এলাকার সবাই তাকে অসম্ভব ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। তিনি মুসলমানদের সব সময় স্মরণ করিয়ে দিতেন, 'তোমাদের প্রথম কেবলা এখনো শত্রু কবলিত। মসজিদুল আকসায় উড়ছে দুশমনের পতাকা। হে আমার যুবক সম্প্রদায়! উঠো! জাগো! ছুটে যাও জেহাদের ময়দানে। আরবের পবিত্র মাটি থেকে খৃষ্টান ও ইহুদীদের বিতাড়িত করে ফিরিয়ে আনো তোমার হৃত গৌরব।'

তিনি কোরআন ও হাদীসের বাণী আবৃত্তি করে মুসলমানদের বুঝাতেন যুদ্ধের গুরুত্ব, জেহাদের মরতবা। সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে খতিব মুসলমানদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতেন তাদের দায়িত্ব কর্তব্য। তিনি বলতেন, 'খৃস্টানরা সমগ্র আরব ভূখণ্ড দখল করে সেখানে খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ জন্য ওরা প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। আর আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি এখানে আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে। এ জন্যই আমরা আমাদের জান ও মাল কুরবানী করছি।'

তিনি সমগ্র আরববাসীদের সম্বোধন করে বলতেন, 'মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বাণী আরবদের ওপর নাজিল করেছেন। কিন্তু এই বাণী এসেছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। আরবদের ওপর এখন কঠিন দায়িত্ব এসে পড়েছে, এই বাণী সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার। আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে পাক (সা.) হেরা পর্বতের গুহায় বসে যে আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন সেই আলোয় বিশ্বের সকল মানুষকে আলোকিত করার মহান দায়িত্ব এখন আমাদের।

আমাদের পূর্ব পুরুষরা এ দায়িত্ব পালন করেছেন। স্মরণ করো মহাবীর তারেক বিন জিয়াদের কথা। তিনি ভূমধ্য সাগরের উপকূলে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর দরবারে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ধৈর্য ও সাহস দান করো। আমি তোমার নাম ও বাণী সাগরের ওপারেও নিয়ে যেতে চাই।' ঈমানী জোশে তিনি এতটাই উদ্বেলিত

হয়েছিলেন যে, প্রবল আবেগ ও জযবা নিয়ে তিনি তার ঘোড়া নিয়ে সাগরের উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

তার পরের কাহিনীও স্মরণ করো। আল্লাহ তাঁর মোনাজাত কবুল করে নিলেন। জাহাজ নিয়ে আরবের বন্দর থেকে তিনি ছুটে গেলেন স্পেনের মাটিতে। সেখানে পৌঁছে তিনি তাঁর জিন্দাদীল মুজাহিদ বাহিনীকে হুকুম দিলেন, 'মুজাহিদ বাহিনী, ইসলামের পতাকা হাতে নিয়ে আমরা এখানে এসেছি ফিরে যাওয়ার জন্য নয়। হয় আমাদের চেষ্টায় এখানে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে, নয়তো এ চেষ্টা করতে করতে আমরা পৌঁছে যাবো আমাদের মহান প্রভুর দরবারে। তাই যে জাহাজে চড়ে আমরা এখানে এসেছি সে জাহাজের আর কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। জাহাজগুলোতে আগুন ধরিয়ে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও ফিরে যাওয়ার সকল সম্ভাবনা।'

তারিক বিন জিয়াদের মতই আজ ক্রুসেডাররাও ইস্পাতকঠিন শপথ নিয়ে এখানে এসে আসন গেড়ে বসেছে। তাদেরও ইচ্ছা, তারা আর ফিরে যাবে না এখান থেকে। আরব ভূখন্ডকে তারা পদানত করতে চায় এ জন্য যে, আল্লাহর মহান বাণী এই আরবেই প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূলে করীম (সা.) ও তাঁর মহান সাহাবীগণ বিশ্ববাসীর কাছে যে সত্য দ্বীন পৌঁছে দিয়েছিলেন সে দ্বীনের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিল এই পাথুরে প্রান্তর থেকেই। এ জন্যই তারা চায়, সমগ্র আরবে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে, যাতে আল্লাহর দ্বীনকে তারা সমূলে উৎপাটিত করতে পারে।

হে মুসলিম জাতি, তোমরা স্মরণ রেখো, ইসলাম কেবল কোন ধর্ম নয়, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। যে বিধান মানুষের দেহ ও মনের সকল চাহিদা পূরণ করে দেয়। এর বিধানগুলো এমন, মানুষের অন্তরে একবার তা প্রবেশ করলে সে অন্তরকে মোমের মত গলিয়ে দেয়। মানুষের অন্তর যত কঠিন আর পাথরই হোক না কেন, কোরআনের বাণী সে পাথরকেও মোমের মত গলিয়ে দিতে পারে।

মুসলমান ভাইয়েরা আমার! কোরআনের বিধানগুলো কোন ব্যক্তির মর্যাদা ও গুরুত্ব রক্ষার জন্য তৈরী হয়নি। তৈরী হয়নি কোন বিশেষ জাতির সম্মান ও অধিকার রক্ষার জন্য। যিনি এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তিনি এ বিশ্বের সকলের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করার জন্যই এ বিধান তৈরী করেছেন। কেবল মানুষ নয়, বিশ্বের সকল সৃষ্টির কল্যাণের কথা চিন্তা করেই এ বিধান তিনি তৈরী করেছেন।

তাই কোরআনের শিক্ষার মধ্যে মানুষের অন্তরের গভীর আকাংখাই ব্যক্ত হয়। এ জন্যই ইসলামকে বলা হয় মানুষের স্বভাব ধর্ম। মানুষের অভ্যাস এবং মনের কামনা বাসনা ও আকুতির কল্যাণময় সমাধানই বিধৃত হয়েছে এর প্রতিটি বিধানের মধ্য দিয়ে। হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের সুষম সমন্বয় ঘটেছে কোরআনের ছত্রে ছত্রে। যিনি কোরআনের বিধান অনুসরণ করবেন কেবল তিনিই পারবেন আল্লাহর হক ও মানুষের হক যথাযথভাবে আদায় করতে।

বন্ধুরা, মনে রেখো, একমাত্র ইসলামই মানুষের সার্বিক অধিকারকে নিশ্চিত করেছে। ইসলাম শুধু ঈমান ও আকিদার

সমষ্টি নয়, নয় কতিপয় বিশ্বাসের নাম। ইসলাম হচ্ছে জাগতিক জীবন যাপনের পূর্ণাঙ্গ নকশা। ইসলাম বলে, মানুষের ইহকালটিই সব নয়, মৃত্যুর পর তার রয়েছে আরেকটি জীবন। যে জীবনটি অনাদি অনন্ত। মৃত্যু পরবর্তী সে জীবনের কথা স্মরণ রেখেই এ দুনিয়ার জীবনকে পরিচালনা করতে হবে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, পরকালীন জীবনে কিভাবে চলতে হবে তার কোন বিধান কোরআনে দেয়া হয়নি। কোরআনের সব কথা এই দুনিয়ার জীবনকে ঘিরে। তাই দ্বীন ও দুনিয়াকে আলাদা করার কোন উপায় নেই। দ্বীন পুরোটাই দুনিয়ার জন্য। দুনিয়ায় কিভাবে চললে মানুষের সমাজ শান্তিময় হবে, তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সফল হবে, কোরআনে সেই কথাই বলা হয়েছে স্পষ্ট করে।

খৃষ্টান ও বিধর্মীরা জানে, যদি ইসলামের এই সার্বজনীন ও সার্বিক কল্যাণের কথা পৃথিবীবাসী জানতে ও বুঝতে পারে, তবে পৃথিবী নামক এই গ্রহটির সর্বত্রই ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষের স্বভাব ধর্মের বিপরীত, খণ্ডিত কল্যাণ আর আংশিক সমৃদ্ধির বার্তাবহ সকল ধর্ম দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। বিদায় নেবে মানব রচিত সকল মতবাদ। তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে জালেম, শোষক ও মানবতার অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শাসক সম্প্রদায়।

তাই যারা নিজেদের সৃষ্ট মতবাদ দিয়ে বা ধর্মের লেবাসের আড়ালে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে ও

বজায় রাখতে চায় তারা ইসলামের অগ্রযাত্রায় বাঁধা দেবেই। এ কারণেই খৃস্টানরা আজ সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইসলামের ওপর। তারা সৃষ্টিকুলের প্রতি আল্লাহতায়ালার এই অপরিসীম করুণা ও দানকে ধ্বংস করে দিয়ে মানুষের জীবন ও সমাজকে বিপর্যস্ত করে দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এই দানবীয় শক্তিকে প্রতিহত না করলে মানবীয় সভ্যতা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

ইহুদীদের সাথে খৃষ্টানরা এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। ইসলামের বিনাশ সাধনের জন্য এই দুই শক্তি একত্রিত হয়েছে। তারা এই আপোষরফায় উপনীত হয়েছে যে, যদি ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান সফল হয় তবে খৃস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাস ইহুদীদের হাতে তুলে দেবে। ইহুদীরা সেখানে একবার মজবুত আসন গাড়তে পারলে আমাদের প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসায় ওরা হযরত সোলায়মানের বিশাল মূর্তি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। এটা ইহুদীদের বহু দিনের পুরনো স্বপ্ন।

এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ওরা অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই পায়নি। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যই ওরা হাত মিলিয়েছে খৃস্টানদের সাথে। এ জন্য খৃষ্টানদের দান করেছে অগাধ অর্থ ও নিজের মেয়েদের। এই দুটি জিনিস যে কোন দলের ভিতরই গাদ্দার সৃষ্টি করে দিতে পারে।

আমি তোমাদের সবার কাছে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সংবাদ পৌঁছে দিতে চাই। এ সব কথা তোমরা

তোমাদের অন্তরে গেঁথে নাও। রাসুলের একনিষ্ঠ সেবক সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তাঁর সেনাবাহিনী এবং জাতির কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এ যুদ্ধ দুই পরস্পর বিরোধী সামরিক বাহিনী বা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যের ক্ষমতার লড়াই নয়, এ যুদ্ধ হচ্ছে দুই ভিন্নধর্মী চেতনা ও ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে। এর একদিকে আছে ঈমান অন্য দিকে কুফর। এক পক্ষে আছে হক অন্য পক্ষে বাতিল। এক পক্ষে মানবিক শক্তি অপর পক্ষে পাশবিক শক্তি।

ভাইয়েরা আমার! আজ পাশবিক শক্তি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখন যদি আমরা এই পাশবিক শক্তিকে প্রতিহত ও নিঃশেষ না করি তবে তারা দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দেবে মানবিক সভ্যতা। প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার দুনিয়ায় আসন গাড়বে স্বার্থপরতা, হিংসা ও ঘৃণার যন্ত্রণা। ইতিহাস বলবে, আমরা ছিলাম বুজদিল, ভীরু ও আহাম্মক। আমাদের হাড়ের ওপর ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের প্রাসাদ গড়বে। ফিলিস্তিনের আকাশে উড়বে ইহুদীদের পতাকা। মসজিদুল আকসায় মূর্তি স্থাপন করে তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে। আরবের উদার আকাশ জুড়ে উড়তে থাকবে নাসারাদের বিজয় নিশান।

হেনসের মুসলমানেরা, তোমরা সুলতান আইয়ুবীর সেনাদলে ভর্তি হয়ে যাও। আল্লাহর সৈনিকদের খাতায় নাম লেখাও হে বীর মুজাহিদবৃন্দ। মুসলমানদের উপর আজ জেহাদ করা ফরজ হয়ে গেছে। আল কোরআন তোমাদের মত মুজাহিদদের উদ্দেশ্য করেই বলেছে, দেশ, জাতি এবং

ধর্মকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধের বাহন ঘোড়া আর সর্বপ্রকার অস্ত্র নিয়ে সব সময় লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে। কোরআনের হুকুম স্মরণ করো আর নিজেদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি জোরদার করো।

তোমরা যারা জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য শপথ নিয়েছো তাদেরকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া আমি জরুরী মনে করি। মনে রেখো, দুশমন জেহাদের অভিনব ও অসংখ্য ময়দান তৈরী করে রেখেছে। সব কটি ময়দান সম্পর্কেই একজন মুজাহিদের স্পষ্ট ধারনা থাকতে হবে।

মনে রেখো, তোমাদের শত্রুরা শুধু সম্মুখ ময়দানেই যুদ্ধরত নেই, তাদের আরও অন্য অনেক যুদ্ধক্ষেত্র আছে। গুজব ছড়িয়ে তোমাদের সৈন্যদের মনে আতংক সৃষ্টি করা তেমনি এক ময়দান। সেনাবাহিনী সম্পর্কে জনমনে কু-ধারণা সৃষ্টি করা তাদের আরেকটি ময়দান। সৈনিক ও অফিসারদেরকে অর্থের প্রলোভন ও সুন্দরী নারীর লালসা দেখিয়ে তাদেরকে বিপথগামী করা তাদের আরেক যুদ্ধ সেক্টর। অর্থ আর নারী এ দুটি জিনিসই মানুষের কাছে বড় লোভনীয় বস্তু। এ দুইয়ের সামনে পড়লে মানুষ সহজেই দুর্বল হয়ে যায়। এর সাথে যদি একটু মদ যুক্ত করা যায় তবে মুসলমান তার ঈমানের মত অমূল্য সম্পদও অজান্তে শত্রুর পদতলে সমর্পন করে দিতে পারে।

এমনটি হওয়া কেবল সম্ভব নয়, আজকাল অহরহই এমনটি ঘটছে। খৃষ্টানরা আমাদেরকে গৃহযুদ্ধে ঠেলে দিয়ে

আমাদের সামিরক শক্তি দুর্বল করে দিয়েছে। খৃষ্টানদের পাতা ফাঁদে আটকা পড়ে এই পাপের কাজটি করেছে কতক ক্ষমতালিপ্সু আমীর ও শাসক। কিন্তু সেই পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে হচ্ছে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে।

শাসকদের এই ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই জীবন দিতে হয়েছে আমাদের নওজোয়ান বীর সেনাবাহিনীকে। আর এভাবেই ওরা দুর্বল করে দিয়েছে ইসলামী হুকুমাত।

গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া জাতি ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে। দুশমন হাততালি দিয়ে দুই দলকেই উত্তেজিত করে মার খাওয়ায়। ফলে ভাইয়ের হাতে নিহত হয় ভাই।

আফসোস! তখন তাদের শাসকরা মহলের হেরেমে মদ ও নারী নিয়ে মেতে থাকে। সেই মহলের নিষিদ্ধ কামরায় স্ফূর্তির যোগান দেয় ইহুদী ও খৃষ্টানেরা। তাদেরকে মদ ও নারীর বাহুডোরে বন্দী করে ভুলিয়ে দেয় তাদের দায়িত্ব কর্তব্য।

তোমরা মনে রেখো, যদি এই পাহাড়গুলো সব সোনা হয়ে যায় আর সেই সোনায় ভরে দেয়া হয় তোমাদের ঘরগুলো তবুও তা জেহাদের মূল্যের সমান হতে পারে না। জেহাদের পুরস্কার পেয়ে আত্মা হয় তৃপ্ত। জীবন হয় সফল। এমন সফল যে, তাদের কখনো মৃত্যু হয় না। তাই আল্লাহ নিজে শহীদদের মৃত বলতে নিষেধ করেছেন।

আত্মা সোনা দানা চায় না, ধন সম্পদ দিয়ে আত্মাকে খুশী করা যায় না। আত্মা খুশী হয় প্রেম আর ভালবাসায়। আর সে

ভালবাসা যখন আল্লাহ্‌র সাথে হয় তখন বান্দার জীবন হয় চূড়ান্তভাবে ধন্য।

হে আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! তোমরা কোরআন পড়েছো। তোমরা জানো, জেহাদের পুরস্কার দেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌র পথে জীবন দেয় তারা কেউ মরে না, তারা হয় চিরঞ্জীব, অমর। শাহাদাতের পেঁয়ালা পান করে তুমিও নিজেকে অমর করতে পারো, নশ্বর পৃথিবীতে হতে পারো চিরঞ্জীব সত্তা।

এই দেহের কি মূল্য আছে যদি তা সভ্যতা ও মানবতার কোন কল্যাণে না লাগে? দেহ তো শয়তানের দোসর হতে পারে, হতে পারে অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত! সামান্য ভোগ ও তৃপ্তির জন্য মানুষ তার ভাইয়ের গলা কাটতে পারে। বন্ধুর বুকে পা রেখে হাসতে পারে শয়তানের অট্টহাসি। এই সব মানুষরাই ধর্মত্যাগী ও মুরতাদ হয়ে যায়। আল কুরআনের পথে এসো! কোরআনই তোমাদের আত্মাকে শান্তি ও তৃপ্তি দেবে।'

খতিব সাহেবের এ ধরনের নসীহত হেমসের মুসলমানদেরকে দ্বীনের পথে অটুট ও অটল রেখেছিল। তাই তারা পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে যুদ্ধের ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। আর এ প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান করছিলেন খতিব সাহেব নিজেই। তিনি তলোয়ার ও বর্শা চালনায় ছিলেন খুবই দক্ষ। তার কাছ থেকে সেই দক্ষতা অর্জন করছিল হেমসের যুব সম্প্রদায়।

সে এলাকায় তিনটি মসজিদ ছিল। সেখানে তিনটি মসজিদেই জেহাদের বয়ান হতো। ফলে জনমত ছিল জেহাদের স্বপক্ষে। এই জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য মেতে উঠলো খৃষ্টান ও ইহুদী চক্র। যে সব খৃষ্টান ও ইহুদী সেখানে বসবাস করতো তারা মুসলমানদের বন্ধু ও দরদী সেজে তাদের মনোরল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ভয়ংকর সব গল্প ও খবর শোনাতে লাগলো।

মুসলমানরা অস্থির হয়ে খতিব সাহেবকে এই নিয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো। খতিব সাহেব হেমসের এক সাহসী যুবককে ডেকে বললেন, 'তোমাকে দামেশক যেতে হবে। সেখানে গিয়ে জানতে হবে রমলার প্রকৃত ঘটনা। আইয়ুবীর সৈন্যদের বর্তমান অবস্থা ও মনোবল নিজ চোখে দেখে এসো তুমি। ইহুদী ও খৃস্টানদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। যুদ্ধে জয়-পরাজয় একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এ নিয়ে এত অস্থির হওয়ারও কিছু নেই। একটি মাত্র ময়দানের জয়-পরাজয় দিয়ে যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় না।'

যুবক যুদ্ধের সঠিক তথ্য জানার জন্য দামেশকের পথে রওনা হয়ে গেল।

এ যুবকের নাম ছিল তানভীর। নির্ধারিত সময়ের আগেই যুবক যুদ্ধের সংবাদ ও তথ্য নিয়ে আবার হেমসের পথ ধরলো।

যুদ্ধের সংবাদ ও তথ্য নেয়ার জন্য তাকে দামেশক পর্যন্ত যেতে হয়নি। রাস্তাতেই তার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। সে হিম্মতের বহু দূর থেকেই ক্রুসেড বাহিনীর ক্যাম্প দেখতে

পেল। তারা এক স্থানে তাবু টানিয়ে বিশাল এলাকা নিয়ে ক্যাম্প করেছিল। সে দূর থেকে পতাকা দেখেই চিনতে পারল, এটা খৃষ্টানদের সেনা শিবির।

তারপর কিছু দূর যেতেই তার চোখে পড়লো দুই উষ্ট্রারোহী। তারা কাছাকাছি হলে সে দেখতে পেল দু'জনই মুসলমান। সে হিম্মতের অদূরের সেনা ক্যাম্প দেখিয়ে ওদের কাছে জানতে চাইল, 'ওটা কাদের ক্যাম্প?'

তারা বললো, 'ওখানে ক্রুসেড বাহিনী ক্যাম্প করেছে।' তারা আরো জানালো, 'এই বাহিনী হিম্মাতে মুসলমানদের হাতে চরম মার খেয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।'

তানভীর বললো, 'আমি হেমস থেকে এসেছি। যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য আমি দামেশক যাচ্ছিলাম। আপনারা কি বলতে পারেন, ক্রুসেড বাহিনী কোন পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং এ পর্যন্ত কতটুকু এলাকা দখল করে নিতে পেরেছে?'

'ওই যে পাহাড়ী অঞ্চল দেখা যাচ্ছে', উটের আরোহীরা তাকে বললো, 'ওই পাহাড়ী এলাকাতেই আমাদের সৈন্যরা আছে। দামেশক এখান থেকে অনেক দূরে, কেবলমাত্র এটুকু খবরের জন্য সেখানে যাওয়ার দরকার নেই। তুমি সোজা ওই পাহাড়ে চলে যাও। এই রাস্তাই তোমাকে মুসলিম বাহিনীর কাছে নিয়ে যাবে। তুমি সেখানে সৈন্যদের যে কারো কাছে জিজ্ঞেস করলেই যুদ্ধের সব খবর জানতে পারবে।'

'কিন্তু আমরা শুনেছি রমলাতে আমাদের বাহিনী পরাজিত হয়েছে!'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছো। রমলাতে যে যুদ্ধ হয়েছিল যেখানে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। পরে হিম্মাত কেল্লার কাছে আবার মুসলমান ও ক্রুসেড বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে ক্রুসেড বাহিনী চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেখান থেকে পলায়ন করে এখানে এসে ক্যাম্প করে।'

'তাহলে আর দামেশক যাওয়ার দরকার কি? আমি এখান থেকেই ফিরে যাই না কেন?' প্রশ্ন করলো তানভীর।

'না, এসেছো যখন সেনা ক্যাম্প পর্যন্ত হয়ে যাও। তবে সাবধান, কোন খৃষ্টান সৈন্যের মুখোমুখি পড়ো না। ওরা যদি জানতে পারে তুমি মুসলমান, তবে সঙ্গে সঙ্গে ওরা তোমাকে হত্যা করে ফেলতে পারে।'

·

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছিল। হিম্মাতের পাহাড়ী এলাকা দিয়ে মুসলিম সেনাক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তানভীর। সামনের দিক থেকে একদল ঘোড় সওয়ার ছুটে এলো। তানভীর রাস্তার এক পাশে সরে গেল। এক অশ্বারোহী ছুটে তার কাছে এসে রাগের সাথে বললো, 'হটো, হটো। রাস্তা থেকে সরে যাও, প্রধান সেনাপতি আসছেন।'

তানভীর আরেকটু সরে রাস্তার আরো পাশ ঘেঁষে চলতে লাগলো, কিন্তু দাঁড়াল না। অশ্বারোহী বললো, 'আরে থামো। রাস্তা থেকে নিচে নেমে দাঁড়িয়ে যাও।'

এ কথায় তানভীর কিছুটা অপমান বোধ করলো। সে রাস্তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল বটে, কিন্তু নিচে নামল না, বরং তার সাথে তর্ক জুড়ে দিল।

সেনাপতি তকিউদ্দিন এগিয়ে আসছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, তার রক্ষী এক পথিকের সাথে রূঢ় আচরণ করছে।

তকিউদ্দিন ওদের কাছে এসে থেমে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে? তোমরা ঝগড়া করছো কেন?'

তানভীর শান্তভাবে বললো, 'আমি হেমস থেকে যুদ্ধের অবস্থা জানতে এসেছি সুলতান। ও আমাকে জোর করে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে।'

'কি জানতে চাও তুমি?'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্যদল এখন কি অবস্থায় আছে এবং ক্রুসেড বাহিনী কতদূর সাফল্য লাভ করেছে?'

'কি জন্য জানতে চাও?'

'হেমসের মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তারা সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছে।'

'কেমন প্রস্তুতি চলছে সেখানে?'

'ওখানে পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতি চলছে। আমাদের বোনেরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রয়োজনে এখনো যারা একেবারে বুড়িয়ে যায়নি সেই সব বুড়োরাও যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এমনকি আমরা আমাদের বাচ্চাদেরও অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি।'

সেনাপতি তকিউদ্দিনের সঙ্গে ছিলেন আলী বিন সুফিয়ানের সহকারী গোয়েন্দা প্রধান হাসান বিন আবদুল্লাহ। তিনিই এখানে গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্ব পালন করছিলেন।

তানভীরকে তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করছিলেন। এ কি কোন গোয়েন্দা? প্রশ্নটা বার বার আঘাত করছিল তার মাথায়। কিন্তু ছেলেটির সরলতা বলছে, সে গোয়েন্দা নয়। তবুও তার সন্দেহ যায় না। সার্থক গোয়েন্দা তো সেই, যে তার পরিচয় গোপন করতে পারে। এই সরলতা ছেলেটির ছদ্মবেশ নয়তো? যদি সে চৌকস গোয়েন্দা হয়ে থাকে তবে সরল গ্রাম্য বালকের চাইতেও সে নিজেকে সরল হিসাবে প্রকাশ করতে পারবে, এটাই তো স্বাভাবিক!

তানভীরের কথা শুনে হাসান বিন আবদুল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের খতিবের নাম কি?'

তানভীর খতিবের নাম বললো। হাসান বিন আবদুল্লাহ তাকে আরো কিছু প্রশ্ন করে নিশ্চিত হলেন, এ ছেলে গোয়েন্দা নয়। তানভীরের ব্যাপারে সৃষ্ট সন্দেহ দূর হয়ে গেলে তিনি তকিউদ্দিনকে বললেন, 'এ লোক সত্যি কথাই বলছে। তার কথায় বুঝা যাচ্ছে, হেমসের লোকেরা মনেপ্রাণেই জেহাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।'

তিনি তানভীরের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি ক্যাম্পে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমরা একটু পরই ফিরে আসবো। তোমার সাথে আরো কথা আছে। আমার সাথে কথা না বলে হেমসে ফিরবে না।'

তকিউদ্দিন তাকে ক্যাম্পের মেহমানখানায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তাকে যথেষ্ট খাতির যত্ন করা হলো।

রাতে হাসান বিন আবদুল্লাহ তাকে নিজের তাবুতে ডেকে নিলেন। তার হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, 'এ চিঠি

খতিবের কাছে পৌঁছে দিয়ে বলবে, অবস্থা সংকটময় ঠিকই, কিন্তু তেমন কঠিন নয়, যেমনটি খৃষ্টান ও ইহুদীরা প্রচার করছে। লোকদের কাছে সত্য গোপন করার দরকার নেই। খতিবকে বলবে, বর্তমান নাজুক অবস্থা জনগণের সামনে তুলে ধরে তিনি যেন জনতাকে তার মোকাবেলার জন্য জাগিয়ে তোলেন। রমলার পরাজয়ের জবাব আমরা খৃস্টানদের দিয়ে দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ আগামীতে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যেটা ওরা কল্পনাও করতে পারবে না। তারা অনেক বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছে, এজন্য তাদের কবর খুঁড়তে আমাদের কিছুটা বেশী সময় লাগছে।

খতিবকে বলবে, জনতার মনের সাহসকে অটুট রাখার জন্য যেন তিনি সচেষ্ট থাকেন। কিছুতেই গুজবে কান দেবে না। হাওয়া থেকে পাওয়া খবরকে কখনোই সত্য মনে করবে না। তোমরা একটি বিপদসংকুল এলাকায় বসবাস করছো। তোমাদের এলাকার ইহুদী ও খৃষ্টানদের দিকে কড়া দৃষ্টি রাখবে। এটাও খেয়াল রাখবে, তারা যেন তোমাদের সকল তৎপরতার খবর না পায়। গোপন তৎপরতা গোপন রাখবে। কতটুকু তাদের জানানো যায়, তিনি যেন হিসেব নিকেশ করে তা প্রকাশ করেন। নিজেদের সকল শক্তি দুশমনের সামনে প্রকাশ করা যেমন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তেমনি তারা যেন তোমাদের শক্তি ও তৎপরতাকে অবজ্ঞার চোখে দেখার সাহস না পায় সেদিকে নজর রাখাও তোমাদের কর্তব্য।'

হাসান বিন আবদুল্লাহ তানভীরকে আরো কিছু সংবাদ দিলেন, যে সংবাদ হেমসের মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধিতে

সহায়ক হতে পারে। কিন্তু তাকে জানতে দিলেন না, হেমসে যে তৎপরতা চলছে তা সুলতান আইয়ুবীর নির্দেশেই চলছে।

এই খতিব সামরিক বাহিনীর এক অফিসার। সুলতানই তাকে হেমসে পাঠিয়েছেন। তাকে হেমসে বসিয়ে রাখার উদ্দেশ্য ছিল, প্রয়োজনের সময় তিনি যেন ক্রুসেড বাহিনীর উপর পিছন থেকে কমান্ডো আক্রমণ চালাতে পারেন।

কিভাবে গেরিলা আক্রমণ করে পালিয়ে যেতে হয়, হেমসের স্বেচ্ছাসেবকদেরকে তা শেখানো হচ্ছিল। এ জন্য হেমসে তিন চার জন গেরিলা কমান্ডারকে আগেই পাঠানো হয়েছে। তারা সেখানে পরিকল্পনামাফিক ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এসব কথা তানভীর কিছুই জানতো না।

খতিব এখনো সেই সব কমান্ডারদের সাথে কোন যোগাযোগ করেননি। কারণ এখনো তিনি তাদের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন অনুভব করছেন না। তিনি তানভীরের কাছ থেকে যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই পরিস্থিতি জানার ওপরই নির্ভর করছিল তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা।

পরের দিন সকালে তানভীর হেমসের দিকে যাত্রা করলো।

সে যুগে লোকজন দূরের রাস্তা দল বেঁধে পাড়ি দিত। যারা একাকী পথ চলতো তারাও পথে নেমেই তালাশ করতো কোন কাফেলার। যখন কোন কাফেলা দেখতে পেতো, তাদের সাথে যোগ দিয়ে এগিয়ে যেতো গন্তব্যে। এভাবে কাফেলা ধীরে ধীরে বড় থেকে বড় আকার ধারণ করতো।

তানভীর একাই পথ চলছিল। সংবাদ নিয়ে দ্রুত দেশে ফিরে যাওয়ার তাড়া ছিল বলে কোন কাফেলায় শরীক হওয়ার জন্য সে উদগ্রীব ছিল না। পথের বিপদ সম্পর্কে নির্বিকার হয়ে সে একাকী পথ চলছিল।

কাফেলায় শরীক হওয়ার ব্যাপারে তার চেষ্টা ও ব্যস্ততা না থাকলেও বিনা চেষ্টাতেই পথিমধ্যে সে এক কাফেলার সাক্ষাৎ পেয়ে গেল। কাফেলাটি হেমসের দিকেই যাচ্ছিল। এ কাফেলায় ছিল হেমসের কিছু ইহুদী বনিক এবং দু'টো খৃষ্টান পরিবার।

খৃস্টান পরিবার দু'টো ছিল উটের উপর সওয়ার। ইহুদীদের অধিকাংশই ছিল অশ্বারোহী। কিছুলোক আবার পদব্রজেও পথ চলছিল।

তানভীর সেই কাফেলায় যোগ দিল। কাফেলা চলছে তো চলছেই। দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করতে হবে বলে ওদের মধ্যে কোন তাড়াহুড়ো ছিল না। বরং সকলেই সামনে পথ চলার জন্য কিছু শক্তি সঞ্চয় করে রাখছিল এবং আস্তে ধীরে এগুচ্ছিল।

দুটি দিন ও রাত কেটে গেল রাস্তায়। তৃতীয় দিন, সফরের শেষ দিন। আজ একটানা পথ চললে মধ্যরাতের আগেই কাফেলা হেমসে পৌঁছে যাবে।

পথে সামনে একটা নদী পড়বে। নদীটি বেশী বড় নয়। পানির গভীরতাও কম। খুব বেশী কোমর পর্যন্ত পানি। এ নদীটি পারাপারের জন্য লোকেরা কোন নৌযান ব্যবহার করতো না, হেঁটেই নদী পার হয়ে যেত।

সূর্য মাথার উপর উঠে এসেছে। কাফেলা সূর্যের খরতাপ উপেক্ষা করে এগিয়ে চললো। বিকালের দিকে আকাশে কালো মেঘ দেখা গেল। দ্রুত সে মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। সূর্যের খরতাপ মিলিয়ে গিয়ে মরুভূমিতে নেমে এলো অন্ধকার।

কাফেলা চলার গতি বাড়িয়ে দিল। ঝড় বা বৃষ্টি আসার আগেই ঠিকানায় পৌঁছে যেতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কোন পাহাড় বা টিলার আড়ালে আশ্রয় নেয়ার জন্য দ্রুত ছুটছিল ওরা। উন্মুক্ত মরুভূমিতে ঝড়ে পড়ার বিপদ সম্পর্কে সবাই কম-বেশী অবগত।

অন্ধকার ঘনীভূত হতে দেখে প্রমাদ গুনলো কাফেলার লোকজন। তারা দিশেহারার মত ছুটতে শুরু করলো।

কিন্তু এটা ছিল কাফেলার লোকদের নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী। মেঘের গতি কাফেলার গতির চেয়ে অনেক বেশী বেগবান। কাফেলা কোন গন্তব্যে পৌঁছার আগেই মেঘ প্রবল বর্ষণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো কাফেলার ওপর। কোথাও আশ্রয় নিতে না পেরে ভারী বর্ষণে ভিজে একাকার হয়ে গেল সবাই।

কাফেলা যখন নদীর পাড়ে গিয়ে পৌঁছলো তখনো মেঘ দুনিয়া অন্ধকার করে মুষলধারায় বর্ষণ করে চলছে। বৃষ্টির কারণে সামনে বেশী দূর দেখা যায় না। বৃষ্টির ঝাপটার ফলে চোখ খুলে পথ চলাও কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

নদী তীরে পৌঁছে ওরা দেখতে পেল নদীর পানি বেশ বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় কি করবে ভেবে পেল না কাফেলা। এক বৃদ্ধ খৃষ্টান চিৎকার করে বললো, 'নদী ভরে যাচ্ছে।

আমার বিশ্বাস, এখনও পার হওয়া যাবে। যদি ওপারে যেতে চাও দেরী না করে জলদি সবাই নেমে এসো।'

বৃদ্ধ চিৎকার করছিল আর নদীর পার বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছিল। তার দেখাদেখি কাফেলার অন্যরাও নদীতে নেমে পড়লো।

বৃদ্ধের সাথে উটের উপর এক যুবতী আরোহী ছিল। কাফেলার কেউ কেউ নদীতে নেমে গেলেও অনেকেই পাড়ে দাঁড়িয়ে নদীতে পানির স্রোত লক্ষ্য করছিল। নদীর পানি ছিল ভীষণ ঘোলা, স্রোতও ছিল তীব্র।

পানির গভীরতা তখনও বেশী হয়নি, কিন্তু মুষলধারায় বৃষ্টি ও ঘন মেঘের কারণে অন্ধকার হয়ে এসেছিল চার ধার। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই সন্ধ্যা নেমে এসেছিল নদীর তীরে।

বুড়োর দেখাদেখি যারা নদীতে নেমেছিল তাদের একজন ঘোড়ার ওপর বসেই পিছন ফিরে ডেকে বললো, 'তোমরাও নেমে পড়ো। দেরী করলে পানির গভীরতা বেড়ে যাবে। তখন আর নদী পেরোতে পারবে না। যারা পদাতিক তারাও নেমে আসতে পারো, এখনো নদীতে পানি তেমন গভীর হয়নি।'

আসলে নদী পার হওয়ার তাড়া তাদের ব্যাকুল করে তুলেছিল, তাই নদীর স্রোতের ভয়াবহতা কাউকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কিন্তু একটু গভীরভাবে কেউ নদীর দিকে তাকালেই দেখতে পেতো, দ্রুত নদীর পানি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

আরো কিছু লোক নদীতে নেমে গেল। বর্ষণের বেগের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নদীর পানি। বাড়ছে স্রোতের তীব্রতা। লোকগুলো ছুটছে ওপারের দিকে। নদীর চেহারা কতটা বিকট ও ভয়ংকর হয়ে উঠছে তা নিয়ে ভাববার সময় পায়নি কেউ, কিন্তু উট ও ঘোড়া বিপদের তীব্রতা ঠিকই বুঝতে পারছিল।

স্বাভাবিক সময়ে এসব প্রাণী অনায়াসেই নদী পার হয়ে যায় কিন্তু প্লাবনের আশংকায় অবুঝ প্রাণীগুলোও ভয় পাচিছল। পানি তখনো তেমন গভীর ছিল না, কিন্তু কাফেলার লোকদের বেশী দূর যাওয়ার সুযোগ হলো না। সহসাই উজান থেকে পাহাড়ী ঢলের পানি নেমে এলো তীব্র বেগে। দেখতে দেখতে ভরে গেল নদী। প্রবল ঢেউ আর কঠিন স্রোত কাউকে সতর্ক হওয়ার সুযোগ দিল না। নদীর পাড় ভাসিয়ে নিয়ে গেল সে স্রোত।

প্রথমে পানির নিচে তলিয়ে গেল পদাতিক যাত্রীরা। তারা তখন বাঁচার আশায় সাঁতার কাটতে লাগলো। যারা সামনে ছিল তারা অল্প দূরেই দেখতে পাচ্ছিল নদীর অপর পাড়। কিন্তু সেই পথটুকুও পার হতে পারছিল না তারা। প্রাণপণ চেষ্টা করে এক হাত এগোয় তো স্রোতের টানে দু'হাত পিছিয়ে পড়ে।

উট এবং ঘোড়াগুলো এ অবস্থা দেখে আর্তনাদ শুরু করলো। কাফেলার লোকজন দেখতে দেখতে একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শেষে অবস্থা এমন হলো, কাফেলার কে কোথায় আছে কেউ তার খবরও নিতে পারলো না।

বুড়োর সাথের খৃষ্টান মেয়েটা চিৎকার করে উঠলো। তানভীর তার নিকটেই ছিল, সে চিৎকার শুনে তাকালো মেয়েটির দিকে। দেখলো, মেয়েটি উটের পিঠে বসে থাকতে পারছে না। প্লাবনের সাথে লড়াই করতে গিয়ে উটটি বেদম দুলছে। সেই দুলুনির কারণে উটের পিঠ থেকে যে কোন সময় ছিটকে পড়তে পারে মেয়েটি।

সহসা মেয়েটির পা উটের পিঠ থেকে পিছলে গেল। মেয়েটি আবারো আর্তচিৎকার করে আঁকড়ে ধরলো উটের রশি এবং হাঁচড়ে পাঁচড়ে তার পিঠে চড়ে বসলো।

প্লাবন উটটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। উটটি হাবুডুবু খাচ্ছিল নদীর মাঝে। ঝড়ের প্রকোপে নদীর ঢেউ কখনো উপরে আবার কখনো নিচে নামছিল। কখনওবা পাকে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

ঝড়ের তাণ্ডব এবং মানুষের চিৎকারের আওয়াজ একাকার হয়ে যাচ্ছিল। ফলে কারো চিৎকারের আওয়াজ কেউ শুনতে পাচ্ছিল না। যদি তানভীর মেয়েটির একদম সন্নিকটে না থাকতো, তবে মেয়েটির চিৎকারও সে শুনতে পেত না।

তানভীর ছিল অশ্বারোহী। তার ঘোড়াও ছিল যথেষ্ট তাগড়া। তারপরও সে ঘোড়া সোজা ওপারের দিকে যেতে পারছিল না। স্রোত তাকেও ভাটির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তানভীর প্রাণপণে চেষ্টা করছিল ঘোড়াকে ওপারে নিয়ে যেতে। ঘোড়াও সাধ্যমত চেষ্টা করছিল প্রভুর হুকুম তামিল করতে।

এ সময়ই তানভীর মেয়েটিকে পানিতে পড়ে যেতে দেখলো। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘোড়া নিয়ে মেয়েটির সাহায্যে এগিয়ে গেল।

ঘোড়ার মুখ মেয়েটির দিকে ঘুরিয়ে নিলেও দ্রুত সেদিকে এগুতে পারছিল না তানভীর। অগত্যা ঘোড়া ত্যাগ করে নিজেই দ্রুত সাঁতরে মেয়েটির কাছে গেল।

মেয়েটি পানিতে পড়ে গেলেও উটের রশি ছাড়েনি। ফলে পানিতে পড়ার পরও মেয়েটি হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেল।

একটা ঢেউ যখম মেয়েটিকে উপরে উঠালো তখন তানভীর তাকে দেখতে পেল। যদিও তুফানের বেগ ছিল উল্টো দিকে তবু যুবক তানভীরের বলিষ্ঠ বাহু হার মানলো না। সে স্রোতের প্রবল তোড় উপেক্ষা করে মেয়েটির সাথে তার যে সামান্য দূরত্ব ছিল তা অতিক্রম করে গেল এবং মেয়েটিকে ধরে ফেলতে সক্ষম হলো।

উটের রশি ছাড়েনি বলে মেয়েটি ডুবে যায়নি ঠিক, কিন্তু তার আর সাঁতরানোর ক্ষমতা ছিল না। স্রোতের প্রতিকূলে লড়াই করতে গিয়ে তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তানভীরের পক্ষেও তাকে সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

তাকে বাঁচাতে গিয়ে স্রোতের অনুকূলে অনেক দূর পিছিয়ে গেল তানভীর। স্রোত তাদের ভাটির দিকে বহু দূর টেনে নিয়ে গেল।

তানভীর মেয়েটাকে তার পিঠের উপর উঠিয়ে নিয়েছিল। স্রোতের অনুকূলে থেকে একটু একটু করে তীরের দিকে সাঁতরে চলছিল তানভীর।

মেয়েটি বার বার পিঠের উপর থেকে পড়ে যাচ্ছিল। তানভীর খেয়াল করে দেখল, মেয়েটি জ্ঞান হারিয়েছে। যদি তানভীরের বাহুতে প্রচণ্ড বল ও মনে প্রবল সাহস না থাকতো, তবে সে মেয়েটিকে আগেই ছেড়ে দিয়ে নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করতো। কিন্তু দুঃসাহসী তানভীর মেয়েটিকে নিয়ে প্লাবনের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখলো। এক সময় তার বাহুও দুর্বল হয়ে এলো।

যে স্থান থেকে কাফেলা নদীতে নেমেছিল, সেখান থেকে কম-বেশী দুই মাইল দূরে ভাটিতে তানভীর মেয়েটিকে নিয়ে নদীর কিনারে উঠতে সক্ষম হলো। এখানে নদীর পারে তানভীর দেখতে পেল মরুভূমির বদলে ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে কোনমতে আছড়ে পড়ে মেয়েটির পাশে কিছুক্ষণ নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলো তানভীর।

তখনো বৃষ্টি থামেনি, তবে বৃষ্টির তোড় কমে এসেছিল। একটু পর তানভীর উঠে বসে মেয়েটির নাড়ি পরীক্ষা করলো। দেখলো মেয়েটি তখনও জীবিত। সে মেয়েটিকে নিয়ে একটা সমান পাথরের ওপর শুইয়ে দিল।

মেয়েটি জীবিত থাকলেও তার তখনো জ্ঞান ফেরেনি। এই অসম লড়াইয়ে তানভীরের শরীর ও মন দুটোই ভেঙে পড়েছিল। ক্লান্তি ও অবসাদ ঘিরে ধরেছিল তাকে। মেয়েটিকে

পাথরের ওপর শুইয়ে দিয়ে সেও তার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো।

শুয়ে শুয়েই সে মেয়েটির হুশ ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলো। হঠাৎ মেয়েটা নড়ে উঠলো এবং নড়তে গিয়ে উপুড় হয়ে গেল। ফলে মেয়েটির পেটের উপর চাপ পড়লো এবং তার মুখ দিয়ে নদীর ঘোলা পানি বের হতে লাগলো। তানভীর এ অবস্থা দেখে তার পিঠে ও কোমরে চাপ দিল। এতে মেয়েটির পেটের বেশীর ভাগ পানিই মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল। সে আরও জোরে চাপ দিল এবং পেটের দুই পাশ থেকেও চাপ দিল। তাতে মেয়েটার পেটের সমস্ত পানিই বের হয়ে পেট খালি হয়ে গেল।

বর্ষণের বেগ কমে গিয়ে ফর্সা হয়ে গেল আকাশ। পড়ন্ত সূর্যের কোমল আলো রাঙিয়ে দিল বর্ষণসিক্ত পাহাড়ের চূড়াগুলো।

তানভীর মেয়েটিকে আবার সোজা করে শুইয়ে দিল। মেয়েটি একটু নড়ে চড়ে চোখ খুললো এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার বন্ধ করে ফেললো চোখ। তানভীরের শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। সে আড়ষ্ঠ হয়ে বসে রইল মেয়েটির পাশে।

তানভীর তার ঘোড়ার কথা চিন্তা করছিল। ঘোড়াটি সে নদীতে ছেড়ে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এখন একটি সংজ্ঞাহীন মেয়েকে নিয়ে সে ঘোড়া ছাড়া কেমন করে পথ চলবে? ঘোড়াটি নদীতে ডুবে মরেছে না তীরে উঠতে পেরেছে তাও তো তার জানা নেই।

তানভীর ঘোড়ার পরিণামের কথা ভাবতে লাগলো। যদি ঘোড়াটি তীরে উঠে থাকে এবং তাকে আবার ফিরে পাওয়া যায় তবে রাত্রি নাগাদ হেমসে পৌঁছার একটু আশা করা যায়। তানভীর উঠে পায়চারী শুরু করলো এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলো, ঘোড়া বা কোন জনমানবের দেখা পাওয়া যায় কি না।

পায়চারী করতে করতে তার ক্লান্তি কিছুটা কমে এলো। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। সে ভাবলো, শিঘ্রই রাত নেমে আসবে। অসুস্থ একটি মেয়েকে নিয়ে এই অন্ধকার রাতে পথ চলার চিন্তা করার অবকাশ নেই। তারচে রাত আসার আগেই কোথাও একটা আশ্রয় খুঁজে নেয়া প্রয়োজন।

এলাকাটা পাহাড়ী অঞ্চল। তার আশা ছিল, এখানে কোথাও না কোথাও পর্বত গহবর পাওয়া যাবে। দূরের যাত্রীরা বন্য প্রাণীর হাত থেকে বাঁচার জন্য পাহাড়ী এলাকায় রাত হলে আশ্রয়স্থল হিসেবে পাহাড়ের গর্ত ও সুড়ংই বেছে নেয়। তানভীর তেমনি একটি সুড়ং খুঁজছিল।

সে মেয়েটিকে পিঠের উপরে তুলে নিয়ে দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলতে লাগলো। কিছু দূর যাওয়ার পর ক্লান্তি এসে আবার তার কাঁধে ভর করলো। এক পাথরের ওপর মেয়েটিকে নামিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলো তানভীর।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সূর্য ডুবতে বসেছে। যে কোন মুহূর্তে টুপ করে হারিয়ে যাবে সূর্য। আশ্রয়ের কোন সন্ধান না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো তানভীর। কিন্তু সে আশা ছাড়লো

না। মনে মনে এই বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে লাগল।

আলো কমে গিয়েঁ একটু একটু করে অন্ধকার হচ্ছিল প্রকৃতি। আবার মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে রওনা হলো তানভীর।

একটি পাহাড়ের টিলা পার হয়েই ও দেখতে পেল ওপাশে বেশ কিছুটা খোলামেলা জায়গা। সেখানে এক পাহাড়ের পাশে চারটি উট দাঁড়িয়ে আছে।

উটগুলো দেখেই সে বুঝে নিল, এগুলো কোন যাত্রীর উট নয়। কারণ উটের উপর কোন গদি বা জ্বীন আঁটা নেই।

সে উটের কাছে গেল এবং সেখানে গিয়েই সে নতুন একটি বিষয় আবিষ্কার করলো। আশেপাশে কোথাও মানুষ আছে। কারণ সে পাহাড়ের এক দিক থেকে বালকদের শোরগোল ও চেঁচামেচি শুনতে পেল।

সে শব্দের উৎসের দিকে লক্ষ্য করে দেখলো সেখানে পাহাড়ের গায়ে একটি উঁচু টিলা এবং টিলার পাশে একটি গহবর। তেরো চৌদ্দ বছরের দুটি ছেলে সেখানে খেলছে। তানভীর অনুমান করলো, ছেলে দু'টি বৃষ্টির সময় দৌড়ে ওই গহবরে আশ্রয় নিয়েছিল, বৃষ্টি চলে যাওয়ায় গহবরের বাইরে এসে খেলছে।

তানভীর মেয়েটিকে কাঁধে নিয়েই ছেলেদের দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেরা ওদের দেখে বেশ অবাক হলো এবং কথা বন্ধ করে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। ওরা কাছে যেতেই এক বালক বললো, 'ওনার কি হয়েছে? আপনারা কি বানের সময় নদীতে নেমে ছিলেন?'

অন্য বালকটি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললো, 'ওনাকে এই গর্তের ভেতর নিয়ে আসুন। এখানে খুব ভাল জায়গা আছে।'

গর্তটি সত্যি খুব সুন্দর ও নিরাপদ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আশপাশের লোক ও রাখালেরা এখানে নিয়মিত যাতায়াত করে। গর্তটিকে কেটে কেটে তারা একটা কামরার মত বানিয়ে নিয়েছে। গহবরের খোলা মুখটা এমনভাবে বানানো, তুমুল ঝড়-বৃষ্টিতেও ভেতরটা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। তাইতো এত মুষলধারার পরও ভেতরটা সম্পূর্ণ শুষ্ক ও পরিষ্কার।

বালকেরা আগে থেকেই কামরায় আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। তানভীর দেখলো, ভেতরে চাটাইয়ের বিছানাও আছে।

তানভীর মেয়েটিকে বিছানার উপর শুইয়ে দিল। পেট থেকে পানি বেরোনোর পর ক্ষণিকের জন্য ওর জ্ঞান ফিরেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার জ্ঞান হারিয়েছিল সে। এখনো তার সেই জ্ঞান আর ফিরে আসেনি।

গহবরের এক পাশে শুকনো ঘাস ও গাছের শুকনো ডাল-পাতা গাদা করে রেখে দেয়া ছিল।

মেয়েটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে এবার সে ছেলেদের দিকে নজর দিল। বলল, 'তোমরা এখানে কি করছো?'

'আমাদের বাড়ী নদীর ওপারে।' এক বালক উত্তর দিল, 'আমরা মাঝে মাঝে উট চরাতে নদীর এপারেও চলে আসি। এক জায়গায় নদী বেশ প্রশস্ত। সেখানে নদীর পানি হাঁটু পর্যন্ত থাকে। আজকে আমরা এখানে আসার পর ঝড়-তুফান ও

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে আমরা আমাদের খেলার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে খেলা করছিলাম। বৃষ্টি থামার পর বাইরে এসে দেখি আপনারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন।'

'বাড়ী কি করে যাবে?' তানভীর প্রশ্ন করলো, 'নদী তো পানিতে ভরে গেছে?'

'এই নদী বৃষ্টিতে ভরতেও যেমন দেরী লাগে না, আবার পানি কমতেও দেরী লাগে না।' এক বালক খুব শান্তভাবে বললো, 'আমরা যেখান দিয়ে যাতায়াত করি সেখানে প্লাবনের তেমন ভয় থাকে না। কারণ ওখানে পানি ছড়িয়ে পড়ে।'

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। সূর্যও ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যার আবছা আলো তখনো বিরাজ করছিল পাহাড় জুড়ে। অন্ধকার জেঁকে বসার আগেই ছেলে দুটি তাদের উট নিয়ে বাড়ী চলে যেতে চাইল। যাওয়ার আগে জানতে চাইল, 'আপনারা কি আমাদের গাঁয়ে যাবেন?'

'না, এ জায়গাটা চমৎকার। এখানেই আমরা রাতটা কাটিয়ে সকাল সকাল বাড়ীর পথ ধরতে চাই।'

'আপনাদের কিছু লাগবে?'

'না, রাত করে তোমাদের আর কষ্ট করতে হবে না। একটা রাতের ব্যাপার তো! একটু কষ্ট হলেও চালিয়ে নিতে পারবো।'

তানভীর তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য না নিয়েই বিদায় করে দিল ছেলে দু'টোকে।

ছেলেরা যাওয়ার পর সে মেয়েটিকে নিয়ে আবার দুশ্চিন্তায় পড়লো। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে সে প্রথমেই

আগুনের উপর শুকনো ডাল চাপালো। নিভু নিভু আগুন আবার পূর্ণ তেজে জ্বলে উঠলো।

আগুন জ্বালিয়ে সে প্রথমেই তার গায়ের ভিজে জামাটি খুলে নিয়ে তা আগুনে শুকোতে দিল। জামা মানে এ্যারাবিয়ান জুব্বা, যা পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে দেয়। জামাটি শুকোতে দিতে পেরে সে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানালো ছেলে দুটিকে। সেই সাথে সে শুকরিয়া প্রকাশ করলো আল্লাহর, যার কাছে একটু আগে সে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। তার মনে হলো, তার ডাকে সাড়া দিয়েই আল্লাহ ছেলে দুটিকে এই বিজন পাহাড়ে পাঠিয়েছিলেন, যেন তারা থাকার মত একটু জায়গা এবং একটু আগুনের সন্ধান পায়। কারণ এই রাতে একটু আগুন না পেলে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠতো।

তানভীর এই সব ভাবছিল, এ সময় মেয়েটির জ্ঞান ফিরে এলো। সে চোখ খুলে নিজেকে এক অবাস্তব জায়গায় দেখতে পেল। তার চোখে মুখে বিস্ময় ও ভীতির ছাপ ফুটে উঠলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে তানভীরকে দেখে আতংকে হা করে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

ঝড়-তুফান আর বিরূপ প্রকৃতির সাথে লড়াই করে তানভীরের চেহারা হয়ে উঠেছিল বিবর্ণ ও ভয়ংকর। চেহারায় লেগেছিল কাদা মাটি। চুল ছিল উস্কোখুস্কো। পানির ঝাপটায় চোখ দুটো হয়ে উঠেছে রক্তবর্ণ। তার ওপর তার টান টান পেশীবহুল উদোম শরীরে আগুনের লাল আভা পড়ায় তাকে দেখাচ্ছিল ঠিক ডাকাতের মত। তাই মেয়েটি তানভীরকে দেখে ভয়ে কোন কথা বলতে পারল না।

তানভীর তার অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, 'ভয় পেও না।' তারপর শান্তনার স্বরে বললো, 'আমাকে তুমি চিনতে পারছো না? আমি তোমাদের কাফেলারই এক যাত্রী, এক সাথেই হেমসে যাচ্ছিলাম আমরা।'

'কিন্তু তুমি তো মুসলমান!' মেয়েটি উঠে বসলো এবং বললো, 'তোমার উপর আমি ভরসা করতে পারি না। তুমি আমাকে যেতে দাও।'

'যাবে? যাও!' তানভীর বললো, 'আমি তো কখনোই তোমার পথ আগলে রাখিনি।'

মেয়েটি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু তার চলার মত কোন শক্তি ছিল না। গহবরের বাইরে ছিল ভীষণ অন্ধকার। মেয়েটি দু'কদম হেঁটে গহবরের মুখে এসে বাইরে দৃষ্টি দিল। সেখানে সে রাতের অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

মেয়েটি আবার ঘুরে দাঁড়াল কামরার দিকে। ভেতরে আগুনের তাপ ও আলোতে যেটুকু জীবনের উত্তাপ আছে বাইরে তার কিছুই নেই। সে তানভীরের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো।

কামরার প্রজ্জ্বলিত আগুনের আভায় তাকে এক রহস্যময় মানুষ মনে হচ্ছিল। সেও তাকিয়ে ছিল মেয়েটির দিকে, দেখছিল তার কাজকর্ম।

মেয়েটির পায়ে তেমন শক্তি ছিল না। সে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। তার পা দুটো আস্তে আস্তে ভাঁজ হয়ে আসছিল। সে দেয়াল হাতড়ে দু'কদম এগিয়েই বসে

পড়লো। বসে পা দু'টো সামনে ছড়িয়ে দিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে অসহায়ের মত তাকিয়ে রইলো তানভীরের দিকে।

'আমার ঘোড়াটি আমার খুবই প্রিয় ছিল। তোমার জন্য আমি আমার সেই ঘোড়াটিকে হারিয়েছি।' তানভীর বললো, 'তোমাকে নদী থেকে বাঁচাতে গিয়ে দেখলাম ঘোড়া আর তোমাকে এক সাথে বাঁচানো সম্ভব নয়। তাই ঘোড়া ছেড়ে তোমাকেই বাঁচালাম।'

'আমার মূল্য বিশটি ঘোড়ার চেয়েও বেশী।' মেয়েটি আহত কণ্ঠে বললো, 'তুমি আমাকে বাঁচিয়ে কোন লোকসানের বোঝা ঘাড়ে নাওনি। হয়তো আমার মত মেয়ে তুমি কোনদিন চোখেই দেখোনি। তুমি ভেবেছো, আমাকে লাঞ্ছিত করে বেঁচে দিলেও ঘোড়ার চেয়ে অনেক গুণ বেশী লাভ করতে পারবে।'

'কে বললো আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করবো? বিক্রি করে দেবো?'

'কেন, এখন তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশী করতে পারো। তোমাকে কে বাঁধা দেবে? কে প্রতিরোধ করবে বলো?'

'আমাকে আল্লাহই প্রতিরোধ করবেন।' তানভীর বললো, 'আর আল্লাহই তো এতক্ষণ প্রতিরোধ করে রেখেছেন। এটা আল্লাহরই এক মোজেজা যে, তিনি আমাকে দিয়ে এই ঝড় ও প্লাবনের হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছেন। নইলে স্রোতের টানে তোমার উট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তোমার বাঁচার কোন আশা ছিল না।'

'তাহলে বলো, এটাও আল্লাহর মোজেজা যে, তিনি এই শুকনো সুন্দর নিরাপদ গুহায় আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন?'

'তা তো অবশ্যই। এটা তাঁর মোজেজা ছাড়া আর কি? আমি তো বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চেয়েছিলাম। তিনি আমার দোয়া কবুল করেছেন। আমাদেরকে এমন একটি গুহা দিয়েছেন যেখানে আগুনও আছে।'

'আল্লাহর সাথে তোমার কোন গোপন সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়নি তো! তুমি যেভাবে কথা বলছো তাতে মনে হয়, তুমি যা চাও তাই আল্লাহ্ দিয়ে দেন?' ব্যঙ্গের সুরে বলল মেয়েটি।

'আল্লাহ তাকেই সাহায্য করেন, যার অন্তর বিশুদ্ধ। আমার অন্তরে কোন কালিমা ছিল না বলেই এত তাড়াতাড়ি আল্লাহর সাহায্য পেয়ে গেছি। দুটি বালক এখানে এই আগুন জ্বালিয়ে রেখে গেছে। এটাও তো আল্লাহরই ইশারা। আমি এক ঈমানদার। ঈমানদারদের সহায় সব সময়ই আল্লাহ। আর তাই তো ঈমানদারগণ কখনো আশাহত হয় না, নিরাশায় ডুবে যায় না।'

তানভীর বললো, 'তুমি আমার সব কথা বুঝতে পারবে না। কারণ যারা ঈমানদার নয়, তারা ঈমানদারদের সব আচরণ বুঝতে পারে না। তুমি যে ভয় পাচ্ছো তার কারণও আছে। ঈমানের আলোয় আলোকিত নয় তোমার অন্তর। ফলে আমি যা দেখতে ও বুঝতে পারি, তুমি তা পারবে না। তোমার চোখে অন্ধত্ব ও অন্ধকারের কালিমা লেগে আছে। তাই তুমি ভয় পাচ্ছো। তোমার দেহের রূপ ও যৌবন নিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন। ভাবছো, সেই আগুনে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দেবো

আমি। কিন্তু না, তোমার এ ভয় অমূলক। তোমাকে বিক্রি করার কথাও কখনো উদয় হয়নি আমার মনে।'

মেয়েটি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে চেষ্টা করলো তার কথা। বললো, 'যদি আমাকে বিক্রি করার কোন ইচ্ছা তোমার না থাকে তাহলে আমাকে দিয়ে কি করবে? সারা জীবন আমাকে ভোগ করবে? দোহাই তোমার, এমন জুলুম তুমি আমার ওপর করো না। তোমার ভোগে আমি বাঁধা দেবো না। কিন্তু কথা দাও, দু'চার দিন বা মাসখানেক পর তুমি আমাকে আমার ঠিকানায় পৌঁছে দেবে?'

মেয়েটির কথা শুনে শরমে কান লাল হয়ে গেল তানভীরের। কোন মতে ঢোক গিলে বলল, 'কি যা তা বলছো বদমাশ মেয়ে? কান খুলে শুনে নাও, আমি আমার আত্মাকে কখনও অপবিত্র করবো না। আমার অন্তরে পাপ লোভ প্রবেশ করাতে চেষ্টা করো না। অবশ্যই তোমার মত সুন্দরী মেয়ে আমি দেখিনি, কিন্তু মুসলমান আপন স্ত্রী ছাড়া অন্যের দিকে হাত বাড়ায় না।'

তানভীরের বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল, মেয়েটির মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হলো না। সে ভয় ও বিস্ময় নিয়ে তানভীরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তানভীরের দৃষ্টিতে সংকল্পের যে দৃঢ়তা, সরলতা ও পবিত্রতা খেলা করছিল মেয়েটি যেন তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

মেয়েটির শরীরে তখনো ভেজা কাপড় লেপ্টে ছিল। শীতে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল মেয়েটি। তানভীরের জামা আগুনের তাপে শুকোচ্ছে। গায়ে কাপড় না থাকায় তার শরীরও শুকিয়ে

এসেছিল। মেয়েটির অবস্থা দেখে সে বললো, 'আগুনের কাছে সরে বসো। বেশীক্ষণ ভেজা কাপড়ে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

মেয়েটি বাধ্য মেয়ের মত আগুনের কাছে সরে এলো, যেন তার আদেশ অমান্য করার কোন উপায় নেই।

তানভীর তার জামার এক প্রান্ত মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, 'এখানে ধরো। আগুনের উপরে দিয়ে এটি আগে শুকাই।'

সে জামার অপর দিকটা ধরে রাখলো, মেয়েটি ধরলো এক পাশ। তারা দু'জনেই জামাটি আগুনের উপরে দোলাতে লাগলো।

তানভীর বললো, 'আমার জামাটি আগে শুকোতে দাও। এটি শুকিয়ে গেলে তুমি পরে নিয়ে তোমার কাপড়ও শুকিয়ে নিতে পারবে।'

'না।' মেয়েটি ভয় পেয়ে বললো, 'আমি আমার কাপড় খুলবো না।'

'তুমি তোমার চামড়া পর্যন্ত খুলে আগুনে শুকাবে।' তানভীর ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, 'আমার কর্তব্যের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না বলছি। আমি তোমার সামনে প্রমাণ করবো, মুসলমানরা বর্বর নয়।'

'মুসলমানরা বর্বর না হলে ভদ্রঘরের এক যুবতীর সঙ্গে তুমি এমন ভাষায় কথা বলতে পারতে না। তোমার ভাষাই বলে দিচ্ছে তুমি কতটা শরীফ লোক।' আবারও তীর্যক কণ্ঠে বললো মেয়েটি।

'আমি ভাল করেই জানি তুমি কেমন পবিত্র মেয়ে! তুমি এখন আমার আশ্রয়ে, তাই আমি তোমার সাথে কোন অভদ্র ব্যবহার করতে পারি না। তুমি নারী। আমার ধর্ম আমাকে কোন নিরুপায় মেয়ের উপর শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেয় না। তোমার সাথে আমি যেটুকু রূঢ় ব্যবহার করেছি, সেটুকু আমার নিরাপত্তার জন্য দরকার ছিল। আমি চাই না তুমি প্রশ্রয় পেয়ে আমাকে কোন পাপের জালে আটকে ফেলো। সে জন্যই এই সাবধানতা।'

'তুমি আমাকে ঝড় তুফানের মধ্যে কেমন করে নদী থেকে উদ্ধার করলে?' মেয়েটি প্রসঙ্গ পাল্টে প্রশ্ন করলো, 'আমাদের অন্য সঙ্গীরা কি সবাই পারে আসতে পেরেছে?'

তানভীর তাকে সব ঘটনা খুলে বলল। আর এ কথাও বললো, 'অনেক দূরে চলে আসায় অন্য সঙ্গীদের ভাগ্যে কি ঘটেছে আমার জানা নেই।'

মেয়েটির ভয় তবুও পুরোপুরি দূর হলো না, তবে কিছুটা লাঘব হলো। সে আগুনের আরো কাছ ঘেঁষে বসলো এবং আগুনের ওপর নিজের কাপড় মেলে ধরে শুকাতে লাগল।

একটু পর। আগুনের তাপে তার শারিরীক অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলো। তানভীর বললো, 'তোমাদের বাড়ী কি হেমস?'

তানভীরের প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, 'না, হেমসে আমাদের আত্মীয় স্বজনরা বাস করে। আমরা দামেশকে বসবাস করতাম। বাবার ইচ্ছে, তিনি সে অঞ্চল ছেড়ে এখন

থেকে হেমসে বসবাস করবেন। এ জন্যই আমরা হেমসে যাচ্ছিলাম।'

তানভীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই বৃদ্ধ বাবার কথা মনে পড়ে গেল মেয়েটির। সে তার বাবার জন্য খুব অস্থির হয়ে উঠলো।

কাফেলার সবাই স্রোতের সাথে লড়াই করে অনেক নাকানি চুবানি খেয়ে অবশেষে যে যেখান দিয়ে পারলো কুলে গিয়ে উঠলো। তীরে পৌঁছে তারা একে অন্যকে টেনে তুলল। দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়া লোকদেরকে ডেকে ডেকে একত্রিত করলো।

সবাই সমবেত হওয়ার পর দেখা গেল তানভীর ও বুড়োর মেয়েটা নেই। লোকজন তাদের খোঁজে নদীর তীর ধরে দুই পাশেই অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে এলো। কিন্তু কোথাও তাদেরকে খুঁজে পেল না।

খুঁজতে খুঁজতে তারা অনেক ভাটি থেকে তানভীরের ঘোড়া উদ্ধার করলো কিন্তু মেয়েটিকে বহনকারী উটের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

তানভীরের ঘোড়া পাড়ে উঠে এক স্থানে দাঁড়িয়েছিল। অনুসন্ধানকারী কাফেলার এক ব্যক্তি সেটিকে ধরে সবাই যেখানে সমবেত হয়েছিল সেখানে নিয়ে এলো।

তানভীরের ঘোড়া দেখে সকলেই বিশ্বাস করলো, তানভীর নামে তাদের সঙ্গে শরীক হওয়া সঙ্গীটি নদীতে ডুবে

মারা গেছে। সেই সাথে তারা এও বিশ্বাস করলো, তাদের সঙ্গী সুন্দরী মেয়েটিও ডুবে মরেছে।

মেয়েটিকে বহন করছিল যে উট, তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া খুঁজে পাওয়া যায়নি আরো দু'জনের উট। সম্ভবত তিনটি উটই স্রোতের টানে ভেসে গেছে বা মারা গেছে।

তানভীরের জন্য কারো কোন দুঃখ ছিল না। কিন্তু দেখা গেল মেয়েটির জন্য তার বৃদ্ধ বাবা, দু'জন খৃষ্টান এবং একজন ইহুদী খুবই মুষড়ে পড়েছে। তারা মেয়েটাকে হারিয়ে এমন ভেঙে পড়লো যে, নতুন করে সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে নদীর পাড়ে বসে পড়লো।

তারা বললো, 'ওকে রেখে হেমসে গিয়ে কি করবো আমরা? আমরা আর হেমসে যাবো না, তোমরা যাও।'

তাদের পেরেশানী ও হায় আফসোস দেখে কাফেলার কয়েকজন আবার তাকে খুঁজতে বেরোলো। তারা দূর দূরান্ত পর্যন্ত মেয়েটিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

কাফেলার অন্যান্য যাত্রীরা বললো, 'তাকে খুঁজে আর কোন লাভ নেই। মেয়ে মানুষ এমন স্রোতের তোড়ে পড়লে ডুবে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সে নিশ্চয়ই ডুবে মারা গেছে।'

চারজন যুবক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে নদীর তীর ধরে ভাটির দিকে চললো। প্রায় মাইল দু'য়েক এসেও তানভীর বা মেয়েটির কোন সন্ধান পেলো না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। একজন বললো, 'চলো ফেরা যাক। জাভিরা বেঁচে নেই। এই

স্রোত ওকে কোথায় নিয়ে ফেলেছে সে হদিস বের করাও সোজা নয়। আর লাশ খুঁজে আমাদের লাভই বা কি?'

ওরা আবার নদী পাড় ধরে উল্টো পথে যাত্রা শুরু করলো। এটা সেই সময় যখন তানভীর মেয়েটিকে প্লাবন ও দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করে তাকে একটা বড় পাথরের উপর শুইয়ে চাপ দিয়ে তার পেটের পানি বের করছিল। সেখানে নদীর বাঁক ছিল এবং সেখান থেকে পাহাড়ী এলাকাও শুরু হয়েছিল। ওরা ছিল পাহাড়ের এক টিলার আড়ালে, তাই তাদের খুঁজতে আসা অনুসন্ধানী দলটি ওদের দেখতে পায়নি।

অনুসন্ধানকারী দলটি তাদের না পেয়ে ফিরে চলে গেল। সূর্য যখন অস্ত গেল তখন নদীর পাড়ে বসে থাকা বৃথা ভেবে তারা হেমসের পথে যাত্রা করলো।

'এমন মূল্যবান মেয়েটিকে হারানোর জন্য যদি কর্তৃপক্ষ আমাদের মৃত্যুদণ্ড না দেয় তবে বুঝবো, তারা আমাদের ওপর খুবই মেহেরবানী করেছে।' বৃদ্ধ বললো, 'কি উত্তর দেবে যখন প্রশ্ন করা হবে, মেয়েটি যখন ডুবে মরছিল তখন তোমরা কোথায় ছিলে?' পথ চলতে চলতে কথা বলছিল ওরা।

'বলবো, সে আমাদের আশ্বস্ত করেছিল, উটের পিঠে চড়ে সে একাই নদী পার হতে পারবে।' ইহুদী বললো, 'আরো বলবো, সে উটের ওপর একলা থাকার জিদ না ধরলে কিছুতেই তাকে আমরা একা উটের ওপর থাকার অনুমতি দিতাম না। সে জিদ ধরলো এবং দুর্যোগ ও স্রোত তাকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।'

'যদি বলে, সে যে আসলেই মারা গেছে তার প্রমাণ কি?'

'সে যদি নদী থেকে পাড়ে উঠতো তবে তাকে আমরা অবশ্যই খুঁজে পেতাম।' বললো অন্য জন, 'সে আসলেই মারা গেছে।'

'যা মনে আসে তাই বলো।' এক খৃষ্টান হতাশ কণ্ঠে বললো, 'যদি আমাদেরকে ক্ষমাও করে দেয়া হয় তবু এই অসাধারণ মেয়েটির জন্য চিরকাল আমার আফসোস হবে।'

'মেয়েটির জন্য আফসোস কেবল আপনার একার হবে না, তার হারিয়ে যাওয়ার অনুতাপ আমাদেরও সারাক্ষণ দগ্ধ করবে।' বলল আরেক জন। 'অন্য একটি মেয়ে যোগাড় করা এখন চাট্টিখানি কথা নয়। আবার একটি মেয়ে আনতে গেলে মাসখানেক সময় লেগে যাবে। অথচ এখন সময় খুবই মূল্যবান।'

'এ জন্যই তো আমি বার বার বলেছিলাম, এ কাজের জন্য অন্ততঃ দুটি মেয়ে দাও।' বৃদ্ধ বললো, 'হেমসের মুসলমানরা জোশে ফেটে পড়ছে। মনে হয়, তারা গোপনে যুদ্ধের প্রশিক্ষণও নিচ্ছে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি তাদেরকে খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, তারা গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে। আমি তাদের চারজন উস্তাদকে দেখেছি। তারা হয়তো কায়রো নয়তো দামেশক থেকে এসেছে। তাদের দেখেই মনে হয় তারা গেরিলা যুদ্ধে উস্তাদ।'

এক খৃষ্টান বললো, 'তাদের এ প্রস্তুতির শেষ কোথায় তুমি কি বলতে পারো?'

ইহুদী বললো, 'ওদের ট্রেনিং আমরা ওদের দিকেই ফিরিয়ে দেবো। ওদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবো, যাতে নিজেরাই লড়াই করে শেষ হয়ে যায়।'

'কথাটা যত সহজে বললে, কাজটা তত সহজ নয়। কাজটি সহজ হতো যদি মেয়েটি আমাদের সাথে থাকতো।' বৃদ্ধ বললো, 'হেমসে গৃহযুদ্ধ ও নাশকতামূলক কাজের যে বিরাট দায়িত্ব দিয়ে আমাদের পাঠানো হয়েছে, মেয়েটিকে ছাড়া সে কাজ আমরা কেমন করে করবো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এ কাজের জন্য আমরা আপনাকে এখান থেকে মেয়ে জোগাড় করে দিতে পারি।' বললো ইহুদী লোকটি, 'তবে সমস্যা হবে তার সাথে আপনার সম্পর্ক নিয়ে।'

'হ্যাঁ, নতুন একটি মেয়ে পাওয়া হয়তো কঠিন নয়। কিন্তু তাকে পাকা শিকারী বানানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া তার সাথে আমার সম্পর্ক কি এ প্রশ্নের জবাব তৈরী করাও কঠিন ব্যাপার। অথচ এই মেয়েটিকে আমি সহজেই নিজের মেয়ে বলে চালিয়ে দিতে পারতাম।'

'হ্যাঁ, মেয়েটির বাবা হিসাবে আপনি চমৎকার মানিয়ে নিয়েছিলেন। আপনারা এমনভাবে বাপ-বেটির অভিনয় করছিলেন, দেখে মনে হতো, ও আসলেই আপনার মেয়ে।'

রাতের অন্ধকারে পথ চলছে ওরা। পথ চলতে চলতে নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে গোপন মিশন সম্পর্কে। ওরা সবাই হেমসে যাচ্ছিল এই মিশন নিয়ে।

বৃদ্ধ লোকটি ছিল খৃষ্টানদের এক অভিজ্ঞ গোয়েন্দা অফিসার। নাশকতামূলক কাজে তার ছিল বিশেষ পারদর্শীতা। পথ চলতে চলতে সে তার সাথীদের বলছিল, কি করে মুসলমানদের মোকাবেলা করতে হবে। সে বলছিল, 'মুসলমানরা প্রত্যেক জায়গাতেই এখন যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। দামেশকে নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী মেয়েদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি মুসলিম জনপদেই আজ এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে হেমস ও তার আশপাশের এলাকায় এ তৎপরতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে গেছে। ওখানকার মুসলমানরা গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছে। যদি তারা হেমসকে তাদের গোপন কেন্দ্র বানিয়ে নিতে পারে তবে আমাদের জন্য তা বড় রকমের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে।'

একজন বললো, 'আমি জানতে পেরেছি, সুলতান আইয়ুবী নিজে হেমসে গোপন কেন্দ্র বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন।'

বৃদ্ধ দৃঢ়তার সাথে বললো, 'আমরা তার পরিকল্পনা সফল হতে দেবো না।'

হেমসের সীমান্ত এলাকায় বাড়ী যে ইহুদীর সে বললো, 'যদি মুসলমানরা এখানে গেরিল্লাদের আড্ডা বানিয়ে নিতে পারে তবে আমাদের জন্য তা চরম বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমি বলছিলাম কি, আমাদের ভূমিকা এমন হওয়া উচিৎ যাতে এখানকার মুসলমানরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়। এ কাজ করতে হলে প্রথমে

তাদের হৃদয় জয় করার সব রকম চেষ্টা চালাতে হবে আমাদের।'

'এটা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।' বৃদ্ধ বললো, 'আমাকে জানানো হয়েছে, আমাদের লোকেরা হেমসে অনেক গুজব ছড়িয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা সে সব গুজব কানেও তুলছে না।'

'এর একমাত্র কারণ সেখানকার জামে মসজিদের খতিব। হেমসের মুসলমানদের ওপর খতিবের প্রভাব খুব বেশী। আমি জানতে পেরেছি, ওখানে যুদ্ধের প্রস্তুতিও তার নির্দেশেই চলছে।'

'আগে আমাকে হেম্‌সে যেতে দাও। আমি খতিবকে দেখতে চাই। দেখবো সে কেমন ধরনের লোক। সে কি সত্যিই পন্ডিত, না সেনা কমান্ডার আমি এটাও একটু বাজিয়ে দেখতে চাই। তখনই আমি বুঝতে পারবো, তাকে আমাদের হাতে রাখা যাবে, নাকি গুপ্তহত্যার খাতায় তার নাম তুলে দেবো।'

'সে লোক সেনা অফিসার কিনা জানি না, তবে লোকটির সম্মোহনী শক্তি প্রচুর। আর সে লোক বোকা বা আহাম্মক নয়।'

'ঠিক আছে, আমি দেখবো সে লোক কতটা চালাক। আমাকে শুধু তুমি একটি বা দুটি খৃষ্টান বা ইহুদী পরিবারের মেয়ে বেছে দিও।'

'আমি আপনাকে একথা দামেশকেও বলেছি, এখানকার মুসলমানরা ঈমানের বলে খুবই বলীয়ান।' এক খৃষ্টান বললো, 'এ পর্যন্ত আমি এখানকার একজনকেও কিনতে পারলাম না।'

'আমি সারাটি জীবন এই নদীকে অভিশাপ দিয়ে যাবো, যে নদী আমাকে জাভীরা থেকে বঞ্চিত করেছে।'

'আমার নাম জাভীরা।' মেয়েটি তানভীরের প্রশ্নের উত্তরে বললো, 'আমরা গরীব লোক। মুসলমানেরা দামেশকে আমাদের জীবন অতিষ্ট করে তুলেছিল। আমি সারা জীবন দোয়া করবো, আল্লাহ্ যেন গরীবের মেয়েকে রূপ-সৌন্দর্য না দেন। তুমি শুনলে অবাক হবে, বড় বড় ধনী ও আমীররা আমাকে ক্রয় করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। একজন তো আমাকে অপহরণেরও চেষ্টা করেছিল। আমার বাবা আমাকে এক আর্মি অফিসারের কাছে নিয়ে গেল। তিনি আমার অভিযোগ শুনে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দু'দিন না যেতেই তিনি আমার দিকে হাত বাড়ালেন।

এ খবরে বাবা খুবই অসহায় বোধ করলেন। শেষে আমার জীবন ও সম্ভ্রমের কথা চিন্তা করে বাবা দেশান্তরী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। হেমসে আমাদের আত্মীয় স্বজন আছে, তাই বাবা আমাকে নিয়ে হেমসে যাচ্ছিলেন।'

মেয়েটি এটুকু বলেই কেঁদে দিল। বলল, 'জানিনা, বাবা বেঁচে আছেন না মারা গেছেন। আমি এক অসহায় ও বিপন্ন মেয়ে। তুমি কি একজন নিপীড়িত মেয়ের ওপর দয়া করবে না?'

রাত গভীর হয়ে এলো। জাভীরার বাবারূপী বুঁড়ো লোকটি খৃষ্টান সঙ্গীদের সাথে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। তারা পথ চলছিল আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায় সে আলোচনা করছিল।

'আমার জামা শুকিয়ে গেছে।' তানভীর তার জামা মেয়েটির দিকে এগিয়ে ধরে বললো, 'আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি এই জামা পরে নিজের ভিজে কাপড়গুলো পাল্টে নাও। এ জামা তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে রাখবে। তোমার কাপড় শুকিয়ে গেলে আমার কাপড় ফিরিয়ে দিও।'

'আমি তোমার কাছে অসহায়।' জাভীরা বিরক্তির স্বরে বললো, 'তুমি আমার সঙ্গে সেই পশুদের মত আচরণ করবে না, যেমন শিকারকে হত্যা করার আগে শিকারী তাকে নিয়ে খেলা করে।'

'আমি তেমন কিছু বলিনি, শুধু তোমার ভেজা কাপড়গুলো পাল্টাতে বলেছি।' তানভীর রাগতঃ স্বরে এ কথা বলেই গুহা থেকে বাইরে চলে গেল। সে আড়ালে চলে গেলে জাভীরা গুহার মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দেখলো, সে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে গুহার ভেতরটা দেখা যায় না। তাছাড়া সে গুহার দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির এ ধরনের সততা ও সাবধানতায় বিস্মিত হলো জাভীরা।

সে দু'দণ্ড পরেই গুহার মুখ থেকে নিচে নেমে এলো। কামরার ভেতরে গিয়ে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল জাভীরা।

আগুনের আলো ছিল খুবই স্পষ্ট। সেই আলোর দিকে পিছন ফিরে সে তার কোমরে হাত রাখলো। তার কোমরের কাপড়ের মধ্যে লুকানো ছিল ছুরি।

জাভীরা কাপড়ের ভাঁজ থেকে ছুরিটা বের করে নিল এবং চাপা পায়ে গুহার মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। গুহামুখে এসে সে তানভীরের দিকে তাকালো। তানভীর তখনো গুহার দিকে পিছন ফিরে অন্যমনস্ক দাঁড়িয়ে আছে।

জাভীরা আলতো পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল এবং মাত্র এক গজ দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। মুঠির ছোরাটিকে সে শক্ত করে ধরলো এবং একজন প্রশিক্ষিত পাকা গোয়েন্দার মতই সেই ছোরা দিয়ে তানভীরের মোক্ষম জায়গায় আঘাত হানার জন্য তৈরী হলো।

জাভীরা তাকে আঘাত করার জন্য যেই হাত বাড়িয়েছে অমনি ত্বরিত বেগে ঘুরে গেল তানভীর। সে জাভীরার ডান হাতের কব্জি চেপে ধরলো এবং এমন জোরে মোচড় দিল যে, ট্রেনিং না থাকলে ওই মেয়ের কব্জি মট করে ভেঙে যেতো। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে ঘুরিয়ে নিল, যে কারণে মারাত্মক একটি দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল জাভীরা। কিন্তু তানভীরের হাতের চাপে তার হাতের ছোরা খসে

পড়লো। তানভীর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে চট করে ছোরাটি নিজের হাতে নিয়ে নিল।

তানভীরের বাঁচার একটাই কারণ, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হঠাৎ করেই তাকে সচেতন করে দিল। তার মনে হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহর এটাও এক মোজেজা। নইলে মেয়েটি যে সাবধানতার সাথে এসেছিল এবং তাকে যেভাবে আঘাত করেছিল তাতে তার বাঁচার কোন কথা ছিল না।

তানভীর ছোরা উঠিয়ে নিয়ে ছোরার মাথা মেয়েটার গায়ে ঠেকিয়ে বলল, 'আমি তোমার জীবন বাঁচালাম, আর তুমি আমাকে হত্যা করতে চাইছো?'

মেয়েটা তার পায়ের উপর পড়ে হাত জোড় করে মিনতি জানালো, 'তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই মানতে রাজি। আমাকে হত্যা করো না।'

'আমি তোমাকে হত্যার কথা এখনো ভাবিনি। তোমাকে ভেজা কাপড় বদলে আমার জামাটা পরতে বলেছিলাম, এর বেশী কিছু চাইনি। কিন্তু তোমার মাথায় আমাকে হত্যা করার চিন্তা এলো কি করে?'

'জানি না। আমার মনে হয়েছিল তুমি আমার সর্বনাশ করে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তোমার ভালমানুষীকে মনে হয়েছে শিকার নিয়ে খেলার মত। আমি একটু সুস্থ হলেই তুমি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, এই চিন্তা আমাকে পাগল করে তুলেছিল। ভয় আর উত্তেজনার বশে কি করতে কি করেছি আমি নিজেই জানি না।'

তানভীর বললো, 'দেখলে তো, তুমি আমাকে হত্যা করতে পারলে না। ঈমানদারদের এভাবেই আল্লাহ হেফাজত করেন। তাদের অন্তরে এমন চোখ দিয়ে দেন, যে চোখ দিয়ে তারা সামনের পেছনের সকল কিছু দেখতে পারে। অন্তরের চোখ দিয়েই আমি দেখতে পেলাম ছোরা নিয়ে তুমি আমার দিকে এগিয়ে আসছো।

আচ্ছা বলতো, আমি যদি বলতাম, আমার সামনেই তুমি তোমার কাপড় খুলে ফেলো, তুমি কি খুলতে না? কিন্তু আমি তা চাইনি, তোমাকে আমি উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে চাই না।'

মেয়েটি আর কোন কথা বলল না। সে আস্তে আস্তে আবার গুহার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো এবং তার গায়ের জামা ও পাজামা খুলে তানভীরের জামাটি পড়ে নিল। আলখেল্লার মত সে জামা মেয়েটিকে বোরকার মত ঢেকে নিল। তারপর সে তানভীরকে ডেকে বললো, 'আমার কাপড় পাল্টানো হয়ে গেছে, এবার তুমি আসো।'

তানভীর ভেতরে গেল। জাভীরার জামা ও পাজামাটি সে আগুনের ওপর শুকাতে লাগলো। জাভীরা আঁড় নয়নে বার বার তাকে দেখতে লাগলো।

তানভীর কোন কথা বলছিল না, জাভীরাও চুপচাপ। তানভীরের নিবরতা জাভীরাকে অস্থির করে তুলছিল। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, এই যুবক তাকে ক্ষমা করবে এবং তাকে ছেড়ে দেবে।

জাভীরা এখন সত্যিকার অর্থেই অসহায়। তার একমাত্র অস্ত্র ছোরাটাও এখন তার দখলে নেই। মেয়েটি সেই অসহায়ত্ব নিয়ে বার বার দেখছিল যুবককে।

যুবক নিরবে মেয়েটির কাপড় শুকাচ্ছিল। যখন কাপড় শুকিয়ে গেল তখন তানভীর কাপড়গুলো মেয়েটার হাতে দিয়ে বলল, 'জলদি তোমার পোশাক বদলে নাও। আমি বাইরে যাচ্ছি।'

যুবক মেয়েটির হাতে কাপড় দিয়ে বাইরে চলে গেল। মেয়েটি পোষাক পাল্টে তানভীরকে ডাকলো, 'আমার কাপড় পাল্টানো হয়েছে। এবার তুমি আসতে পারো।'

তানভীর গুহায় ঢুকে ছোরাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'তোমার খঞ্জর তোমার কাছেই থাক। এখানে খাবার দাবার কিছু নেই যে তোমাকে খেতে দেবো। বেশী ক্ষুধা পেলে ঘুমুতে পারবে না। তারচে তুমি এখনই শুয়ে পড়ো। সকালেই আমরা হেমসের দিকে যাত্রা করবো।'

'তুমি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছো।' জাভীরা ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, 'অথবা তুমি অনুভূতিহীন কোন মৃত মানুষ। কোন প্রতারক বা মৃত ব্যক্তির সামনে আমার ঘুম আসবে না। ভয়ার্ত মানুষের ক্ষুধা বা ঘুম কিছুরই অনুভূতি থাকে না।'

'আমি মৃত কি জীবিত সেটা প্রমাণ হবে তোমাদের সৈন্যদের সামনে পড়লে। আর প্রতারণা করা তোমাদের কৌশল, আমাদের নয়। আমার সততা যদি তোমার কাছে প্রতারণা মনে হয় তবে এই প্রতারণাই তো এখন তোমার কাম্য হওয়া উচিত। যেভাবেই হোক, তোমার দিকে আমি

হাত না বাড়াই, এটাই কি তুমি চাও না? তাহলে যতক্ষণ আমি হাত না বাড়াচ্ছি ততোক্ষণ তুমি ঘুমিয়ে নাও।

জাভীরা, সত্যি কথা বলতে কি, তোমার সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই! আমি শুধু তোমাদের সেই বাহিনীর শত্রু, যারা আমাদের মাতৃভূমি দখল করতে আসে, যারা এখনও আমাদের প্রথম কেবলার উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে।'

'তোমাকে মিথ্যা ও ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে উত্তেজিত করা হয়েছে।' জাভীরা বললো, 'তুমি সেই অজ্ঞ লোকদের একজন, যারা সভ্যতার সঠিক ইতিহাস জানে না। যাকে তুমি তোমাদের প্রথম কেবলা বলছো, আসলে সেটা ইহুদীদের মন্দির। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তাঁর রাজ্যসীমা বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করার অভিপ্রায়ে তোমাদেরকে ভুল ইতিহাস শেখাচ্ছেন। তোমার মত সরল সহজ মুসলমানদের মনে ধর্মীয় আবেগ ও জযবা সৃষ্টি করার জন্য তিনি বলছেন, ওটা তোমাদের প্রথম কেবলা ও প্রথম মসজিদ!'

'এ নিয়ে আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না।' তানভীর বললো, 'তুমি এখন শুয়ে পড়ো, তোমার কাছ থেকে ইতিহাস শেখার কোন আগ্রহ নেই আমার। খতিবের কাছ থেকে ইতিহাসের অনেক পাঠ আমি আগেই নিয়েছি।'

'আমার ঘুম আসবে না।' জাভীরা বললো, 'এক অপরিচিত পুরুষের সামনে কোন যুবতী নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে না। এটা প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তি। তুমি যতো আমাকে ঘুমের জন্য চাপ দেবে ততোই ঘুম আমার কাছ থেকে আরো দূরে সরে যাবে। তার চেয়ে কথা বলতে থাকো, তোমার মত

আমিও এক রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবো। খতিবের কথা কি যেন বলছিলে? তিনি কি হেমসের বাসিন্দা, নাকি বাইরে থেকে এসেছেন?'

'তিনি হেমসেরই লোক।' তানভীর আর কথা বাড়াতে চাইল না। সে জাভীরার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে বললো, 'তুমি সারা রাত জেগে থাকলে আমার করার কিছু নেই, আমি শুয়ে পড়লাম।'

তানভীর তার জামা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো।

জাভীরা ছিল অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। দীর্ঘ ট্রেনিং দেয়ার পর তাকে ময়দানে পাঠানো হয়েছে। ট্রেনিং শেষে প্রথমে তাকে দামেশকে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে দক্ষতা প্রদর্শনের পর তাকে হেমসে যাওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়। মানুষের পেট থেকে কথা বের করার নানা কৌশল রপ্ত করা আছে তার। এ উদ্দেশ্যেই তাকে হেমসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

সে হেমসের খতিব ও সেখানকার মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে তানভীরের কাছ থেকে তথ্য নেয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তানভীর তার ফাঁদে পা দিতে চাইল না। তাই সে মেয়েটির সাথে কথা বলা বন্ধ করে ঘুমাতে চেষ্টা করলো।

তানভীর নীরব হয়ে যাওয়ার পর চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া মেয়েটির আর করার কিছু ছিল না। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর এক সময় ঘুম এসে মেয়েটিকেও কাবু করার চেষ্টা করলো। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে এলো জাভীরার শরীর। ঘুম তাড়ানোর সব চেষ্টা নিষ্ফল করে দিয়ে ঘুম এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

রাত অনেক গভীর। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে তানভীর। ঘুমের ভান করলেও আসলে সে ঘুমায়নি। যে মেয়ে তাকে একটু আগে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল তার সাথে এক কামরায় নিশ্চিন্তে ঘুমোবার মত বোকামী সে করতে পারে না। মেয়েটি অনেকক্ষণ একাকী চুপচাপ বসে থাকার পর যখন ঘুমে ঢলে পড়লো, উঠে বসলো তানভীর।

নিশ্চিন্তে ঘুমানোর মত পরিবেশ ও মনের অবস্থা ছিল না কারোরই। কিন্তু তারপরও ঘুম এমন এক নেয়ামত যা মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও শান্তির রাজ্যে নিয়ে যায়। মাঝ রাতের দিকে ঘুমিয়েছিল জাভীরা। যখন চোখ খুললো তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে।

ঘুম ভাঙতেই জাভীরা ভীত সন্ত্রস্তভাবে উঠে বসলো। বাইরে ভোরের আবছা অন্ধকার। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো তানভীর সিজদায় পড়ে আছে।

সিজদা থেকে উঠলো তানভীর, আবার সিজদায় গেল। পুনরায় দাঁড়িয়ে নামাজে মগ্ন হয়ে রইল। জাভীরা অপলক চোখে দেখছিল এক আত্মমগ্ন মুজাহিদকে।

জাভীরা তার পোষাকের দিকে নজর দিল। রাতে ঘুমাবে না বলে সংকল্প করেছিল সে, কিন্তু কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায়নি। তানভীরকে ভয় পাচ্ছিল সে। তার ধারনা ছিল, শত হোক, পুরুষ মানুষ তো! কিন্তু সে যে অবস্থায় ঘুমিয়েছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই নিজেকে আবিষ্কার করে বিস্মিত হলো।

সে অপলক চোখে তানভীরের নামাজ পড়া দেখছে। কি একাগ্র মনে নামাজ পড়ছে লোকটা! তাকে যখন সিজদায়

পড়ে থাকতে দেখলো, তখন ব্যাপারটা তার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগলো।

মুসলমান সম্পর্কে তার ধারণা ছিল, মুসলমানরা পশুর মতই বর্বর জাতি। কিন্তু তানভীরের মত সুপুরুষ এক যুবক যখন তার মত রূপসী যুবতীর দিকে মোটেই আমল দিল না, তখন সে ভাবতে লাগলো, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে! মুসলমান তো সে জীবনে এই প্রথম দেখেনি। তার রূপের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে এমন মুসলমানের সংখ্যা তো কম নয়! কত বড় বড় দরবেশ শ্রেণীর মুসলমানও সে দেখেছে। তারা তার জালে ধরা দিয়েছে অবলীলায়। সে ভাবতে লাগলো, এ যুবক কি সত্যি মানুষ, নাকি স্বপ্নলোকের কোন ফেরেশতা মানুষের বেশ ধরে তাকে ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা করতে এসেছে!

জাভীরার কাছে সতীত্বের কোন মূল্য ছিল না। শিশুকাল থেকেই পুরুষ নাচানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তাকে। তার রূপ ছিল যাদুর মত আকর্ষণীয়। দেহে ছিল যৌবনের সম্ভার। ভোগের মাঝে পাপের কোন চিহ্ন দেখার দৃষ্টি সে পায়নি। ভেবেছে, ভোগ হচ্ছে মানুষের স্বভাব ধর্ম, বয়সের খেলা। কিন্তু জীবনে নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলো সে। যে অভিজ্ঞতার কথা সে কোন দিন কল্পনা করেনি, যে অভিজ্ঞতা তার স্বপ্নেরও অতীত।

মানুষের স্বভাবের একটা বিশেষ দিক হলো, তার স্বভাব পরিবর্তনশীল। চেতনায় নতুন কোন আলোড়ন সৃষ্টি হলে বা কোন বিশেষ ঘটনায় চিন্তা রাজ্যে হঠাৎ পরিবর্তনের ঢেউ

জাগলে তার জীবনধারাই পাল্টে যায়। মানুষের মৌলিক মানবীয় সত্ত্বা বা প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বভাবজাত জীবনধারা কারো কাছে স্পষ্ট না থাকলে সে বিকল্প ধারায় তার জীবন পরিচালিত করতে পারে। পাকা অভিনেতার মতই জীবন নাট্যের নাট্যমঞ্চে ছদ্মবেশীর অভিনয় করে যায় সে সারা জীবন। কিন্তু যখন তার সামনে তার জন্ম ও সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হয়ে যায় তখনি সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে মৌলিক মানবিক স্বত্ত্বায় ফিরে আসতে। গতকাল বিকাল থেকে আজকের ভোর, মাত্র একটি রাতের ব্যবধান, কিন্তু সারা জীবন যে প্রশ্ন তাকে ব্যতিব্যস্ত করেনি মাত্র কয়েকটি ঘন্টার কিছু ঘটনা-দুর্ঘটনা তাকে চিন্তার অতল তলদেশে নিক্ষেপ করলো।

জাভীরার চোখের সামনে ভেসে উঠল আকাশ কালো করা মেঘ, অঝোর ধারার বৃষ্টি, বৃষ্টির সাথে পৃথিবী দলিত মথিত করা ঝড়-তুফান, সেই তুফানের মধ্যে একদল মানুষের নদী পাড়ি দেয়ার অদম্য চেষ্টা, পাহাড়ী ঢল ও স্রোতের মুখে অসহায় মানুষের আহাজারি, দুর্যোগ ও মৃত্যুর বিভীষিকা।

মরণ কত সহজ। এক সাথে যাদের সাথে নদীতে নামলাম, যখন মৃত্যু এসে ছোবল হানলো তখন সবাই পালিয়ে গেল। যাদের দায়িত্ব ছিল আমার জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা, এখন তারা কোথায়? অথচ কি অবাক কাণ্ড, যে ছেলের সাথে জীবনে কোনদিন দেখাও হয়নি, নিজের জীবন বিপন্ন করে সেই যুবক তাকে উদ্ধার করে আনলো স্রোতের মুখ থেকে।

তারপর? তারপরের কাহিনীই কি কম চমকপ্রদ? যাকে দেখলে পণ্ডিতও পশু হয়ে যায় তার সাথে নির্জন এক কামরায় রাত কাটালো তরতাজা সুপুরুষ যুবক, কিন্তু তার মধ্যে বিন্দুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্যও সৃষ্টি হলো না। এর রহস্য কি? কে তাকে রক্ষা করলো পতনের হাত থেকে? ক্ষুধার্ত মুসাফিরের সামনে সুস্বাদু খাবার, কিন্তু কেন সে সেই খাবারের দিকে হাত বাড়ালো না? তানভীরের প্রার্থনারত হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে বার বার এই প্রশ্নই করতে লাগল জাভীরা।

পরবর্তী বই ক্রুসেড-২২

হেমসের যোদ্ধা

ক্রুসেড-২১
ধাপ্পাবাজ
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশন